বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-ফেব্রুয়ারি। সাল-২০২৬

অমিত শাহের ভাষণ *(শেষ কিস্তি)*

বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির গ্যারান্টি

নয়াদিল্লিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার সংসদীয় দলের বৈঠকে
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সহ দলের অন্যান্য বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দ।

'নবীন'-বরণ। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন-কে
বরণ করে নিলেন দলের প্রবীণ সম্মানীয় নেতৃত্ব।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দার লেয়েন যৌথভাবে ঘোষণা করলেন
ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। 'মাদার অফ অল ডিলস'।

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
ফেব্রুয়ারি সংখ্যা। ২০২৬

বাস্তুচ্যুত হিন্দু শরণার্থীদের নিয়ে
শ্রী অমিত শাহের বক্তৃতার শেষ কিস্তি ৪

বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির গ্যারান্টি ৭
জয়ন্ত গুহ

ডিএ দয়ার দান নয়, কর্মচারিদের ন্যায্য অধিকার
সুপ্রিম ধাক্কায় বেসামাল মমতা সরকার ৯
কল্পনা গোস্বামী

আনন্দপুরে মোমোয় মিশে গেল মানুষ পোড়া গন্ধ ১১
স্বাতী সেনাপতি

ভোটের ভাঁওতা
নেই রাজ্যের বাজেটে শুধুই বিজ্ঞাপনী চমক ১৩
অভিরূপ ঘোষ

সাক্ষাৎকার ডঃ নারায়ণ চক্রবর্তী ১৬

ছবিতে খবর ১৮

নীতিন নবীন - বিজেপিতে নতুন প্রজন্মের সূচনা
বিজেপিতে নেতা তৈরি হয়, উত্তরাধিকার নয় ২৪
সৌভিক দত্ত

বিকশিত ভারতের মজবুত বাজেট ২৭
দিব্যেন্দু দালাল

বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না,
চাইলেও কি গুজরাট হতে পারবেন? ৩০
সোমনাথ গোস্বামী

ভারত–ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি
ট্রাম্পের ডিলের ফাইল-মুক্তি ৩২
অনিকেত মহাপাত্র

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

আচমকা বাঘাদা-র সঙ্গে বিধানসভার সামনে দ্যাখা। দেখ রে নয়ন মেলে···না। কেসটা জন্ডিস মনে হচ্ছে! কেমন যেন একটা ঘোলাটে চোখ। এলোমেলো চুল। দিশাহীন হেঁটে চলেছে বাঘাদা। মুখোমুখি হতে জিজ্ঞাসা করলাম কচুরি খাবে? খেঁকিয়ে উঠে বলল- রাজ্যটা যাচ্ছে রসাতলে। এখন কচুরি খাবে···বলে ন্যাকামি হচ্ছে?
-আরে আরে বাঘাদা, ক্ষেপে যাচ্ছ কেন? গুপীদা কই?
-রেগেমেগে চলে গেছে গুজরাট।
-এই খেয়েছে! বাংলার বাঙালী গুপীদা এখন গুজরাটে পরিযায়ী শ্রমিক!
-হ্যা। ফাইল 'চুরি'-র দিন থেকেই গজগজ করছিল। সুপ্রিম কোর্টে ম্যাডাম কালো চাদর জড়িয়ে ঢুকতেই রেগে কাই। এরপরই বাংলাকে বাই বাই।
পরিস্থিতি হালকা করতে আমি বললাম- একটা গান ধরো না দাদা।
-গান কি আমি গাই? তবে বলছ যখন গাই একটা।
থমথমে মুখে ধরল গান। 'আজ কি আনন্দওও ঘোড়ার ওই ডিমেএএ / এক ডিম/ দুই ডিম/ তিন তিন ডিম।
-একটা নয়। দুটো নয়। তিন তিনটে ঘোড়ার ডিম! কি সব ভুলভাল বাঘাদা।
-ভুলভাল? ওই করেই তো লাটে তুলেছ সব। আর এখন শেষবেলায় অশ্বডিম্ব প্রসব।
-মানে?
-ওই যে ট্রেডমিলে হাঁটিতে হাঁটিতে বহু ভাবনাচিন্তা করিয়া একটি অশ্বডিম্ব প্রসব করিল। নাম তার বাজেট! এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ভোকাট্টা। আর বাজেটে বলছে বেকারভাতা দেবে। জনকল্যাণমূলক কাজে শ্রাদ্ধশান্তি করিয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ বাড়িল আর বাড়ির ছেলেমেয়েরা? কলেজ শেষ করিয়া কি করিবে? গরু-কয়লা-বালি পাচার?
দুই নম্বর ডিম এক্কেবারে ভ্যাবাচ্যাকা কেস। ঘাবড়ে গিয়ে পেড়ে ফেলেছে। ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। আচমকা থাপ্পড়ে ঘোর নিম্নচাপ এবং বেদম ভয়েই ঘোড়ার ওই প্রি-ম্যাচিওর পচা ডিম। ডিমের নাম 'কমিটি'। উপায় ছিল না। ইমিডিয়েটলি দেবে কি করে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ! ৫০ শতাংশ মহিলা ভোটের লোভে ৫০০-র প্রতিশ্রুতির কি হবে তাহলে? বাজেটে নির্বাচনী প্রচার! হে হে। নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট।
সবশেষে সিনেমার শেষ দৃশ্যের ব্যর্থ নায়ক। এক্ষেত্রে নায়িকা। ডিমের রং কালো। আরে 'পোতিবাদ পোতিবাদ'। পোতিবাদের রং কালো। খুব সিনেম্যাটিক কিন্তু। এটা অ্যাকচুয়ালি মেগালোম্যানিয়াক ডিম। ফাটলে 'ধুরন্ধর' টিআরপি। না ফাটলে আদ্যশ্রাদ্ধের আয়োজন নিশ্চিত। ফাটবে কি ফাটবে না- টিভির পর্দায় সবাই প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু বেচারা কাচুমাচু ডিম গড়িয়ে গিয়ে এমন ছড়িয়ে লাট করেছে দেশের রাজধানীতে যে ঘোড়াও হাসছে। অবশ্যই আড়ালে। বাঘিনীর ভয়ে। আসল নয়। এ বাঘ পার্টটাইম করে, চিড়িয়াখানায় বাঘের আমাশয় হলে।

বাস্তুচ্যুত হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি ঐতিহাসিক অবিচার কংগ্রেসের সংশোধন করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার

১০ অক্টোবর ২০২৫, নয়াদিল্লিতে 'দৈনিক জাগরণ' আয়োজিত **'নরেন্দ্র মোহন স্মৃতি বক্তৃতা'**-য় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **শ্রী অমিত শাহ** তাঁর শাণিত যুক্তি ও তথ্যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে অনুপ্রবেশের ফলে দ্রুত বদলে গেছে জনসংখ্যার মানচিত্র এবং আক্রান্ত হয়েছে দেশের গণতন্ত্র। ভয়াবহ অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্যে। এই সংখ্যায় তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার **শেষ কিস্তি।**

সংসদে, বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সাংসদরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন, "আগে যা ঘটেছিল, তা ঘটেছে। কিন্তু আজও কি অনুপ্রবেশ ঘটছে?" আমি তাদের বলেছিলাম, এখনও ঘটছে। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, "তাহলে এর দায়িত্ব কার? বিএসএফ কি আপনাদের অধীনে নেই?" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, এটাও আমার দায়িত্ব। কিন্তু একবার সীমান্তটি দেখে এসো। বাংলাদেশ সীমান্তে অসংখ্য ঝর্ণা, সমুদ্রের মতো নদী, ঘন বন এবং পাহাড়ি অঞ্চল রয়েছে যেখানে সঠিক সীমান্ত বেড়া নেই। এই অঞ্চলগুলি থেকে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে রোধ করা যায় না। বিএসএফ প্রয়োজনে মানুষকে বাধা দেয়, থামায়, এমনকি গুলিও চালায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভূ-প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ওখানে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন।

তারপর আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, এই অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্ত অতিক্রম করে কোথায় যায়? স্বাভাবিকভাবেই, তারা প্রথমে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে প্রবেশ করে। যখন কেউ গ্রামে আসে, তখন পাটোয়ারী (এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তা ব্যক্তিরা) কি জানেন না? আমাকে বলুন, পাটোয়ারী কি জানেন না? পশ্চিমবঙ্গের একজন পাটোয়ারী কি কখনও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে? একটিও কি এফআইআর দায়ের হয়েছে? কে আধার কার্ড দেয়? জেলায় কালেক্টরের অফিস। অন্যান্য সমস্ত কাজ আধারের উপর ভিত্তি করে। তাই, এই ধরনের গণ্ডগোলে সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা

ভোটার তালিকা শুদ্ধ করা নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য। যদি কমিশন তা না করে, তাহলে কি রাজনৈতিক দলগুলি তা করবে? আর যদি কমিশনের প্রক্রিয়া নিয়ে কারও আপত্তি থাকে, তাহলে তারা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে।

কেবল কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন্দ্রের দায়িত্ব আছে; আমরা ব্যাপকভাবে ফেন্স তৈরি করেছি। কিন্তু কিছু অঞ্চলে ফেন্সিং প্রায় অসম্ভব। কারণ বন্যার জল, পাথুরে এবং শক্ত জমি যা খনন করা অসম্ভব। তাই, **যখন এই ধরনের ভূখণ্ড দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন কে তাদের আশ্রয় দেয়? রাজ্য সরকারগুলি তা করে। এবং কেন? কারণ কিছু রাজনৈতিক দল তাদের ভোট ব্যাংক হিসাবে দেখতে শুরু করেছে। সেই কারণেই তাদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।** আমি সকল রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানাতে চাই, অনুপ্রবেশ, জনসংখ্যা, অথবা এসআইআর ইস্যুকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করবেন না। এমন সময় আসবে যখন আপনিও নিরাপদ থাকবেন না। এটি কোনও রাজনৈতিক সমস্যা নয়; এটি একটি জাতীয় সমস্যা।

যখন অনুপ্রবেশকারীদের জেলা প্রশাসন সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তখন কে কিভাবে অনুপ্রবেশ বন্ধ করবে? আমাদের সীমান্ত আছে গুজরাটে, রাজস্থানে। সেখানে কেন অনুপ্রবেশ ঘটে না? সীমান্ত আছে, ফেন্সিং আছে, বিএসএফ একই, তাহলে পার্থক্য কী? পার্থক্য হলো উদ্দেশ্য। অনুপ্রবেশকে রাজনৈতিকভাবে দেখা উচিত নয়, এবং এটিকে রাজনৈতিক সুরক্ষা দেওয়া উচিত নয়।

বন্ধুরা, যারা শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হয় তারা তাদের নিজস্ব বিবেককে প্রতারণা করছে। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, ১৯৭০-এর দশকে, যখন ইদি আমিন উগান্ডা শাসন করেছিলেন, তখন অনেক ভারতীয় নির্যাতন থেকে পালিয়ে ভারতে এসেছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার কেন তাদের আশ্রয় দিয়েছিল? তারা আর কোথায় যেতে পারত? ভারত ছিল তাদের আশ্রয়ের স্বাভাবিক স্থান। সেই কারণেই তারা শরণার্থী ছিল। সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছিল; তারা নির্যাতিত হয়েছিল, এবং আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম। একইভাবে, যারা তাদের ধর্ম, তাদের পরিবার এবং তাদের মহিলাদের সম্মান রক্ষা করতে এখানে আসে, তাদের আশ্রয় দেওয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্য। এটি

ছিল ১৯৫১ সালে ভারতীয় ইউনিয়নের দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি।

অতএব, অনুপ্রবেশকারী এবং শরণার্থীদের ভিন্নভাবে দেখা উচিত, তাদের পরিস্থিতি ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। অনুপ্রবেশের ফলে নিরাপত্তা সমস্যা, স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক অনুপ্রবেশকারী মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালান এবং জাল টাকার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ধরা পড়েছেন। এগুলি সবই জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় এবং গভীর সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে।

ঝাড়খণ্ড সফরে গিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি যে আদিবাসী জনসংখ্যার তীব্র হ্রাস ঘটেছে। কেন? বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের কারণে। বন্ধুরা, নির্বাচন কমিশন যখন এসআইআর পরিচালনা করছে, তখন কংগ্রেস দল অস্বীকারের মোডে চলে গেছে। তাদের সত্য এবং মিথ্যার সংজ্ঞা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তাদের কাছে, নরেন্দ্র মোদী সরকার যা বলে তা মিথ্যা; এবং তাদের কাছে যা কিছু কাল্পনিক মিথ্যা আছে তা সত্য।

এসআইআর প্রথমবার হচ্ছে না, ১৯৫১ সাল থেকে পরিচালিত হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে পরিষ্কার রাখা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আমরা যদি সেটা না করি, তাহলে কমিশন কার্যকরভাবে কাজ করতে পারবে না।

আমাদের সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে। এবং তখনই সেটা কেবল সম্ভব যখন ভোটার তালিকায় প্রতিফলিত হবে একজন ভোটারের প্রকৃত পরিচয়। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে, একজন ভোটারের প্রথম যোগ্যতা- ব্যক্তিকে অবশ্যই একজন ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। যদি তা কেউ পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে সংসদে একটি প্রস্তাব আনুন যাতে বলা হবে যে ভারতে যে কেউ ভোট দিতে পারে। দ্বিতীয় যোগ্যতা হল বয়স- ১৮ বছর।

এখন, কারো বয়স ১৮ বছর কিনা তা যাচাই করার জন্য অথবা কেউ ভারতীয় নাগরিক কিনা তা যাচাই করার জন্য, আপনাকে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, আর এসআইআর এটাই করে। তারা এটা জানে, তবুও তারা এর বিরোধিতা করছে, কারণ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলে তা তাদের তথাকথিত ভোট ব্যাংককে প্রভাবিত করবে।

বন্ধুরা, ভোটার তালিকা শুদ্ধ করা নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য। যদি কমিশন তা না করে, তাহলে কি রাজনৈতিক দলগুলি তা করবে? আর যদি কমিশনের প্রক্রিয়া নিয়ে কারও আপত্তি থাকে, তাহলে তারা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। এর বিরুদ্ধে কেউ মিছিল করতে পারেন? অবশ্যই না, সাংবিধানিক সঙ্গতি লঙ্ঘন হয় তাতে।

এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে রয়েছে। তবুও তারা তা মেনে নিতে রাজী নয়। বিভিন্ন এলাকায় ৩০%, ২০%, ১৫%, এমনকি ১১% অনুপ্রবেশকারী সনাক্ত করা হয়েছে। আমি সকলকে বলতে চাই এসআইআর অথবা ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ অভিযানে দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে: ব্যক্তিটি ১৮ বছর বয়সী কিনা এবং তারা ভারতীয় নাগরিক কিনা। এটি কেবল কমিশনের অধিকার নয়; এটি তাদের সাংবিধানিক কর্তব্য। এই প্রক্রিয়ায় কারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

বন্ধুরা, আজ অনুপ্রবেশ নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে, আমি আরও বলতে চাই যে বিশ্বের ৯০% দেশ ভূ-রাজনৈতিক রাষ্ট্র। তাদের সীমানা এবং পরিচয় তৈরি হয়েছে যুদ্ধ এবং কারা তাদের ভূখণ্ড জয় করেছিল, অথবা সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। ভারতের মত দেশ ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে নয় বরং ভূ-সাংস্কৃতিক সত্তা থেকে জন্ম নিয়েছে। **আমরা একটি ভূ-রাজনৈতিক রাষ্ট্র নই; আমরা একটি ভূ-সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র।** এবং যদি কেউ এই ভূ-সাংস্কৃতিক জাতির আত্মাকে সত্যি অর্থে বুঝতে চায়, তাহলে রাষ্ট্রীয় সীমানার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। **আমরা কেন কিছু মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলাম? কারণ এই জাতি ১৯৫১ সালে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং আমরা আজ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করছি।**

বন্ধুরা, যখন দেশভাগ হয়েছিল, এবং আমি এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যদিও আমার অনেক সহকর্মী একমত নন, **ধর্মের ভিত্তিতে এই দেশ ভাগ করা একটি ঐতিহাসিক ভুল ছিল। আপনি আসলে ভারত মাতার দুটি হাত কেটে ফেলেছিলেন এবং ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র সফল করতে সাহায্য করেছিলেন।** এটি কখনও হওয়া উচিত ছিল না। আমাদের দেশে, বহু ধর্ম শতাব্দী ধরে সহাবস্থান করেছে - জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম হাজার হাজার বছর ধরে বিদ্যমান, শিখ ধর্ম দশম গুরু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শতাব্দী ধরে আমরা দশম গুরুকেও শ্রদ্ধা করি। **আমাদের ইতিহাসে কখনও ধর্মের নামে কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। তাহলে ধর্মীয় ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয় বা নাগরিকত্ব কীভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে? ধর্ম এবং জাতীয়তা আলাদা রাখা উচিত ছিল।** যেহেতু ধর্ম এবং জাতীয়তা আলাদা রাখা হয়নি, তাই এই সমস্ত বিরোধ এবং বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। **১৯৫১ সালের নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হত, তাহলে শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে সমসাময়িক বিতর্কের অস্তিত্ব থাকত না।** বন্ধুরা, যখন অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার তালিকায় স্থান করে নেয়, তখন তারা আমাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠে। এই পর্যায় থেকে, আমি এই দেশের প্রতিটি নাগরিককে জিজ্ঞাসা করতে চাই- ভারতের নাগরিকদের ছাড়া অন্য কারও কি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে? কোনও রাজ্যের নাগরিকদের ছাড়া অন্য কারও কি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার

আছে যে কে তাদের মুখ্যমন্ত্রী হবে? তাহলে আপনি কাকে রক্ষা করছেন? এই দেশের জনগণকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা উচিত। যখন আপনি অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করছেন, তখন আপনি আমাদের গণতন্ত্র এবং আমাদের পবিত্র সংবিধানের চেতনাকে কলুষিত করছেন।

নির্বাচনই নির্ধারণ করে যে গণতন্ত্র কে পরিচালনা করবে এবং যারা নাগরিক নয় তাদের যদি ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তাহলে তারা ভোট দেবে জাতীয় স্বার্থের জন্য নয় বরং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্য, মানে "যে আমাকে এখানে বেআইনিভাবে থাকতে দেবে"। যখন ভোট আর জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত হয় না, তখন সেখানে আর যাই হোক গণতন্ত্রকে খুঁজে পাওয়া যায়না।

এই কারণেই ভারতীয় জনতা পার্টি ১৯৫০ সাল থেকে তিনটি নীতি গ্রহণ করে আসছে - সনাক্ত কর, মুছে ফেল এবং বিতাড়িত কর। (ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট)। আমরা অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করব, ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম মুছে ফেলা নিশ্চিত করব এবং তাদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাব। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এবং আমি বিশ্বাস করি যে ভারতের জনগণের এই "থ্রি ডি" ইস্যুতে বিজেপিকে সমর্থন করা উচিত কারণ এই তিনটি 'ডি' জাতির আত্মা, সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তৈরি।

এই দেশে কোটি কোটি মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন। কোনও কিছু নিয়ে তাদের কেউ কোনও দোষারোপ করেনি। তারা ভোট দেয়, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের ভোটকে স্বাগত জানানো হয়। এই দেশে হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা বছরের পর বছর ধরে আমাদের ক্ষমতার বাইরেই রেখে দিয়েছিল, এবং তাও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য। আমরা অনেক রাজ্যে নির্বাচনে হেরেছি। অটলজির ছয় বছরের সরকারের পরেও, আমরা সাধারণ নির্বাচনে হেরেছি - ফলাফল এসেছে এবং আমরা তা মেনে নিয়েছি। কিন্তু ভোটের অধিকার কেবল তাদেরই হওয়া উচিত যারা এই দেশের নাগরিক, যারা এর সংস্কৃতি, ভাষা এবং গণতন্ত্রের প্রতি অনুগত।

বন্ধুরা, আমাদের সংবিধানই আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে, ৩২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র ১৮ বছর বা তার অধিক বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের মাধ্যমে ভোটারদের নিবন্ধন, নির্বাচনী পদ্ধতি এবং ভোটার ও প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। এসআইআর প্রথমবার হচ্ছেনা। আমি বুঝতে পারি যে **রাহুল গান্ধীজি হয়তো জানেন না, তবে কিছু সিনিয়র কংগ্রেস নেতার মনে রাখা উচিত যে তাঁর প্রপিতামহের সময় এসআইআর হয়েছে, তাঁর ঠাকুমার সময় এসআইআর হয়েছে, তাঁর বাবা-র সময়েও এসআইআর হয়েছে।** তাহলে এখন কেন এর বিরোধিতা? তারা কেন বলে না যে তারাও একই কাজ মানে এসআইআর করেছিল। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভোটার তালিকা শুদ্ধ করা একটি পবিত্র কাজ এবং এটি আমাদের গণতন্ত্রকে শুদ্ধ করবে।

বন্ধুরা, আমি আবারও বলতে চাই, যখন এত বিপুল সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী থাকে, তখন কোনও দেশই নিরাপদ থাকতে পারে না। সীমান্ত এলাকায় তারা রাজনীতি এবং আইনশৃঙ্খলা উভয়কেই প্রভাবিত করে। শহরাঞ্চলে তারা দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেয়। উপজাতি অঞ্চলে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পাশাপাশি, জমি দখলের অভিযানও চলছে - এবং এটি কোনওভাবেই জাতির স্বার্থে নয়। এই কারণেই, এই ১৫ আগস্ট (২০২৫), প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লা থেকে একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন জনসংখ্যা পরিবর্তন মিশন তৈরির ঘোষণা করেছিলেন। এই মিশনটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করবে - এটি অবৈধ অভিবাসনের ফলে তৈরি হওয়া জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করবে, দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের উপর প্রভাব অধ্যয়ন করবে, জনসংখ্যা পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণগুলি বিশ্লেষণ করবে, অস্বাভাবিক ভাবে বসতি স্থাপনের ধরণ এবং সমাজের উপর তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরীক্ষা করবে এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনার উপর কতখানি চাপ বাড়াচ্ছে তার মূল্যায়ন করবে।

এই সব গবেষণার পর, ভারত সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন জমা পড়বে। আমি জানি ওই প্রতিবেদন আসার পরে, আবার বিতর্ক হবে। কিন্তু বিতর্ক এবং জাতির নিরাপত্তার মধ্যে, বিতর্ক এবং আমাদের সংস্কৃতির সুরক্ষার মধ্যে, বিতর্ক এবং আমাদের গণতন্ত্রের সংরক্ষণের মধ্যে, যদি কোনও একটিকে বেছে নিতে হয়, তবে বিজেপি সর্বদা গণতন্ত্র রক্ষা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণকে বেছে নেবে। এবং আমরা প্রতিটি বিতর্কের মুখোমুখি হব দৃঢ়তার সাথে, ভারতের জনগণের সামনে আমাদের উত্তরগুলি উপস্থাপন করব।

আমি জনগণের কাছে আন্তরিকভাবে আবেদন করছি- অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না; তথ্যের গভীরে যান, সত্যের মধ্যে ডুব দিন। যতক্ষণ না আমরা- এই জাতির নাগরিকরা- আমাদের নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হই, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব নাগরিকদের নিজেদের। ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে যারা প্রতিবেশী দেশ থেকে আসে তারা অনুপ্রবেশকারী নয়, তারা শরণার্থী, এবং শরণার্থীদের ভারতে স্বাগত জানানো হয়। তারা নাগরিকত্ব পাবে- এই আইন ইতিমধ্যেই বিদ্যমান। তবে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কেবল তিনটি পথ বাকি আছে- **ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট।**

বন্দে মাতরম।

বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ
বিজেপির গ্যারান্টি

জয়ন্ত গুহ

এ রাজ্যে বিজেপির জয় নিশ্চিত। কেউ আটকাতে পারবে না। কোনও কিছুই আর আটকাতে পারবে না। ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। লক্ষ্য বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ। এটা বিজেপির গ্যারান্টি। নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি। দেশের স্বার্থেই বিকশিত করতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। এই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েই নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "বিকশিত ভারত সম্ভব নয় বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া"।

যে বাংলা একসময় স্বাধীনতার যুদ্ধে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, যে বাংলাকে নিয়ে বলা হত 'আজ যা বাংলা ভাবে, আগামীতে ভাবে গোটা দেশ-সেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এখন দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে মিছিল করেন কলকাতায়। ভুয়ো ভোটারদের আটকাতে দিল্লিতে গিয়ে বিরুদ্ধাচারণ করছেন তাঁরই দেশের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেন দেশের শীর্ষ আদালতে এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। এমনকি ডাক দেন সংসদের উভয় কক্ষে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইম্পিচমেন্ট প্রস্তাব আনার। তিনি কি জানেন না অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে কোনও মিছিল সংবিধান বিরোধী? তিনি কি জানেন না তার আদি দল কংগ্রেস দেশের ক্ষমতায় থাকাকালীন নেহরু, ইন্দিরা এবং রাজীব গান্ধীর সময়ে এসআইআর হয়েছিল? তিনি কি জানেন না তার দলের 'সম্পদ' তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম ফরাক্কার বিডিও অফিসে এসআইআর বিরোধিতায় যা করেছে তা সংবিধান বিরোধী এবং কার মদত ছিল মনিরুলের পিছনে? ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল-কে 'ওয়াই প্লাস' ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন দিতে হল এই বিশেষ নিরাপত্তা? জানেন না কি মুখ্যমন্ত্রী? কেন বার বার বলা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সীমান্তে ফেন্সিং তৈরির জমি দেয়নি রাজ্য? কেন দিল্লিতে থাকাকালীন তার পাশে এসে তার ইন্ডি জোটের বন্ধুরা, বিশেষ করে কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টি-আরজেডি-আপ-শিবসেনা-র নেতারা কেউ এসে দাঁড়ালো না? তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তার সীমাহীন দুর্নীতি-অসাংবিধানিক কার্যকলাপ-চোখে মুখে মিথ্যাকথা এবং দেশের নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা করার কারণেই জাতীয় রাজনীতিতে তিনি অপ্রাসঙ্গিক। দিশাহীন অসহায় সর্বোচ্চ আদালতে এবং রাজ্য রাজনীতিতে তার আগের সেই

ক্যারিশমা আর নেই। নিজের এলাকা ভবানীপুরেই আদৌ জিতবেন কিনা তা নিয়ে তার নিজেরই সন্দেহ আছে। নিজের রাজ্যে তিনি একঘরে কোণঠাসা। তার দল ইতিমধ্যেই অস্তিত্বহীন। একটি জীবন্ত ফসিল। দল চালাচ্ছে কিছু হুব্বা আর সরকার চলছে নিছক বিজ্ঞাপনের চমকে। চালাচ্ছে ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত এক এজেন্সি।

ব্যারাকপুরে বিজেপি কার্যকর্তা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ প্রশ্ন তোলেন যে আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যু, ২৭ জন নিখোঁজ, এখনও অবধি কেন মোমো কারখানার মালিককে গ্রেফতার করা হয়নি? সে কার সাথে বিমান যাত্রা করেছিল?-প্রশ্ন তুলে কি ভুল করেছেন অমিত শাহ? যে মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর বিরোধিতা করতে পৌঁছে যান নয়াদিল্লি, তিনি আনন্দপুর ঘটনার পর কেন গেলেন না ঘটনাস্থলে? যারা মারা গেল-নিখোঁজ এবং মুখ্যমন্ত্রী সবাই তো এই বাংলারই বাঙালী? এখানেই তো প্রশ্ন উঠছে 'জয় বাংলা'-র দরদ আসলে কোন বাঙালী এবং কোন বাংলা নিয়ে? দরদ কি বাংলাদেশী বাংলায় কথা বলা অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা বাঙালী নিয়ে নাকি বঙ্কিমের বাংলা নিয়ে? বন্দেমাতরমের বাংলা নিয়ে? বঙ্কিমের বাঙালী নিয়ে দরদ থাকলে কেন বন্দেমাতরম নিয়ে সংসদের আলোচনায় তৃণমূল বিরোধিতা করেছিল? সরাসরি অমিত শাহ ব্যারাকপুরের মঞ্চ থেকে বলেছেন যে তৃণমূলের এই বন্দেমাতরম বিরোধিতা নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা নয়। বাংলার অস্মিতা এবং দেশের বিরোধিতা করেছে তৃণমূল। প্রশ্ন তুলেছেন শ্রী অমিত শাহ, কেন বর্ডার ফেন্সিং-এর জন্য জায়গা দেয়নি মমতা ব্যানার্জি? অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কেন আটকায় না মমতা পুলিশ? কেন তৃণমূলের নেতারা অনুপ্রবেশকারীদের জাল নথি তৈরি করে সাহায্য করছে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে? দেশের সুরক্ষা নিয়ে কেন এই ছেলেখেলা তৃণমূলের?-প্রশ্ন তুলে কি ভুল করেছেন অমিত শাহ?

'জয় বাংলা'-র আড়ালে জামাতিদের নিয়ে কেউ হয়তো 'পশ্চিম বাংলাদেশ' তৈরির স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শ্যামাপ্রসাদের বাংলায় সেই স্বপ্নের বীজ চারাগাছ হয়ে ওঠার আগেই যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে তা নিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন শ্রী নীতিন নবীন। বাংলা সফরে এসে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি সরাসরি বলেছেন, "বাংলাকে আমরা পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেবনা। এটাই আমাদের সংকল্প"। প্রশ্ন তুলেছেন তিনি বাংলায় একের পর এক ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে, মা-বোনদের সুরক্ষা এবং গরীবকল্যাণ নিয়ে।

তৃণমূল সরকার নিয়ে এ রাজ্যের মানুষ এতটাই অতিষ্ঠ যে মমতা ব্যানার্জিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জানুয়ারি মাসে ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ এ রাজ্য থেকে চলে গেছে ওড়িশায়। কলকাতায় আয়োজিত ওড়িশা সরকারের ওই বিনিয়োগকারী সম্মেলনে ২৭টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে ৮১,৮৬৪ কোটি টাকার এবং ১৯টি বিনিয়োগের প্রস্তাব থেকে এসেছে ১৮,৪৫৩ কোটি টাকা। প্রায় ৯০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা।

যবে থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া তখন থেকে খেয়াল করলে দেখা যাবে মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রবেশকারী ভোট ব্যাঙ্ক বাঁচাতে মূলত ব্যস্ত আছেন এসআইআর বিরোধিতাতেই। তিনি জানেন তার 'উন্নয়নের পাঁচালি'-র মিথ্যা বিজ্ঞাপনে এবার তিনি কিছুতেই জিততে পারবেন না। ওই পাঁচালির যদি জোর থাকতো তবে মমতা আত্মবিশ্বাসী হতেন। তার দলের উদয়ন-মনিরুলরা গুন্ডামি মস্তানি করত না। তিনি রাজ্য ছেড়ে সপার্ষদ দিল্লি গিয়ে পড়ে থাকতেন না। উনি জানেন উনি আগামী নির্বাচনে হেরে যাচ্ছেন। উনি জানেন জনকল্যাণের নামে বিজ্ঞাপনী চমক দেওয়া ছাড়া উনি কিছু করেন নি। নিশ্চিত হারের দোরগোড়ায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তবুও কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন, বিজেপি কি পারবে তৃণমূলকে হারাতে? তাদের জন্য অমিত শাহের কথায় জবাব খুব পরিষ্কার- "রামসেতু তৈরির সময় রাবণও পরিহাস করেছিল— ভেবেছিল তাকে কেউ হারাতে পারবে না।" এরাজ্যে আগামী নির্বাচনে বিজেপি শুধু জিতবে না, অমিত শাহের কথায়, "এ বার বিজেপির ভোট ৩৮ শতাংশ থেকে লাফ দিয়ে ৪৫ শতাংশে পৌঁছবে।" সাধারণত শতাংশের হিসাব দিয়ে এভাবে দাবী করেন না অমিত শাহ। যখন করেন নিশ্চিত হয়েই করেন। বিহার নির্বাচনের আগেও এভাবে শতাংশের হিসাবে দাবী করেছিলেন শাহ।

এ রাজ্যে বিজেপির জয় নিশ্চিত। কেউ আটকাতে পারবে না। কোনও কিছুই আর আটকাতে পারবে না। ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। লক্ষ্য বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ। এটা বিজেপির গ্যারান্টি। নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি। দেশের স্বার্থেই বিকশিত করতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। এই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েই নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "বিকশিত ভারত সম্ভব নয় বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া"। সিঙ্গুরের জনসভা থেকে তিনি আবারও বলেছেন, "তৃণমূলের শাসনে কন্যা সন্তান সুরক্ষিত নয়, শিক্ষা ব্যবস্থা মাফিয়াদের হাতে চলে গেছে, বাংলায় মা-বোনদের কাছে অনুরোধ যতদিন বাংলায় তৃণমূল ক্ষমতায় থাকবে ততদিন আপনার সন্তান সুরক্ষিত নয়। বিজেপিকে দেওয়া আপনাদের এক একটি ভোট বলে দেবে, বাংলায় সন্দেশখালীর মত ঘটনা ঘটবে না, হাজার হাজার শিক্ষক চাকরি হারাবে না"।

ডিএ দয়ার দান নয়, কর্মচারিদের ন্যায্য অধিকার

সুপ্রিম ধাক্কায় বেসামাল মমতা সরকার

কল্পনা গোস্বামী

দেশের শীর্ষ আদালতের ধাক্কা নাকি থাপ্পড় বলা উচিৎ এই রায়কে? যদি থাপ্পড় বলি তাহলে বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের নিয়ে রাজ্য সরকারের টালবাহানা-বঞ্চনা এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলে খেলার বিরুদ্ধে সুপ্রিম থাপ্পড়।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ সংক্রান্ত যে চূড়ান্ত রায় দান করেছে, তার ফলে বাংলার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক দীর্ঘস্থায়ী ও যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং কঠোর পর্যবেক্ষণসহ বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মহার্ঘ ভাতা কোনো দান বা প্রশাসনিক করুণা নয়; বরং এটি সরকারি কর্মচারীদের একটি আইনত বলবৎযোগ্য অধিকার। আদালত ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সময় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, রাজ্য সরকার 'আর্থিক সংকট' বা 'তহবিলের অভাব'-এর দোহাই দিয়ে কর্মীদের এই ন্যায়সংগত পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। রায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বকেয়া অর্থের অন্তত ২৫ শতাংশ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছতার সাথে তদারকি করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের দীর্ঘদিনের আইনি কৌশল ও টালবাহানাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আদালত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, রাজ্যের নিজস্ব রোপা (ROPA) বিধির ৩(১)(সি) ধারা অনুযায়ী নিখিল ভারত উপভোক্তা মূল্যসূচক (AICPI)-কে মানদণ্ড করেই এই পাওনা হিসাব করতে হয়েছে। দীর্ঘ এক দশকের আইনি লড়াই এবং রাজপথের আন্দোলনের পর এই রায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য এক নৈতিক ও সাংবিধানিক জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে।

২০১১ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরকারি কর্মচারীদের সাথে প্রশাসনের সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে, যা কালক্রমে এক দীর্ঘ আইনি যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে যখন কেন্দ্রীয় হারের সাথে রাজ্যের ডিএ-র ফারাক বাড়তে শুরু করে, তখন থেকেই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। ২০১৬ সালে অধ্যাপক অভিরূপ সরকারের (Chairman) নেতৃত্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠিত হলেও এর সুপারিশ কার্যকর করতে দীর্ঘ চার বছর সময় নেওয়া হয়েছে। অবশেষে ২০১৯ সালে যে রোপা বিধি জারি করা হয়েছে, তাতে ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ব্যবহার করে পে-ম্যাট্রিক্স প্রথা চালু করা হলেও মুদ্রাস্ফীতির সাথে সংগতিপূর্ণ ডিএ-র বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল প্রথমে কর্মচারীদের দাবি নাকচ করেছিল, কিন্তু ২০১৮ সালে ক্যালকাটা হাইকোর্ট ঐতিহাসিক রায়ে জানায় যে ডিএ একটি আইনি অধিকার। রাজ্য সরকার এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রিভিউ পিটিশন দাখিল করলে ২০২২ সালে হাইকোর্ট তা পুনরায় খারিজ করে তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দেয়। হার মানতে নারাজ সরকার ২০২২ সালের শেষদিকে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে এবং দীর্ঘ চার বছর ধরে অগণিতবার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার পর অবশেষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এসে আইনি পরিসমাপ্তি ঘটেছে। রোপা ২০১৯-এর মাধ্যমে সরকার ডিএ-কে ইনডেক্স থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে চেষ্টা করেছিল, সর্বোচ্চ আদালত আজ সেই অপচেষ্টাকেই অসাংবিধানিক বলে চিহ্নিত করেছে।

এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে রাজ্যের প্রায় ৮ লক্ষ সরকারি কর্মচারী এবং ৩.৫ লক্ষ পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হতে চলেছেন। অর্থাৎ,

প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ মানুষ এবং তাদের পরিবার আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আর্থিক বিচার পেয়েছে। সরকারি হিসাব বলছে, শুধুমাত্র বকেয়া মেটাতেই সরকারের প্রয়োজন হবে প্রায় ৪১,০০০ থেকে ৪৫,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই বিশাল অংকের দায়বদ্ধতা এড়াতে সরকার গত কয়েক বছরে এক ভয়াবহ প্রশাসনিক স্থবিরতা তৈরি করেছে। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় ৩.৫ লক্ষ শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও সরকার দীর্ঘকাল স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া স্তব্ধ করে রেখেছে। শিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বা ভূমি সংস্কার—প্রতিটি দপ্তরেই নিয়োগের পরিবর্তে 'চুক্তিভিত্তিক' বা 'অস্থায়ী' কর্মী নিয়োগের এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়েছে। সমালোচকদের মতে, স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ রাখা সরকারের এক সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশল। নিয়োগ বন্ধ রেখে যে হাজার হাজার কোটি টাকা 'বেতন' হিসেবে সাশ্রয় হচ্ছে, সরকার সেই অর্থকে সুকৌশলে জনমোহিনী অনুদান বা ডোল পলিটিক্স-এর রসদ হিসেবে ব্যবহার করছে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হরণ করে সেই অর্থ খয়রাতি প্রকল্পে ব্যয় করার এই নীতি রাজ্যের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

রাজ্যের সাম্প্রতিক প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুদান-রাজনীতির আধিক্য সরকারি কর্মচারীদের এই ন্যায্য অধিকারকে বছরের পর বছর কোণঠাসা করে রেখেছে। যেখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পে বছরে প্রায় ২৬,০০০ কোটি টাকা বা তার বেশি বরাদ্দ করা হচ্ছে, সেখানে কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ ডিএ মেটানোর ক্ষেত্রে সরকারের 'তহবিল শূন্যতা'-র তত্ত্ব কোনোভাবেই ধোপে টেকে না। ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অনুৎপাদনশীল সামাজিক প্রকল্পগুলোতে (Unproductive Expenditure) ব্যয় বরাদ্দ জ্যামিতিক হারে বাড়ছে, অথচ মুদ্রাস্ফীতির বাজারে কর্মচারীদের প্রকৃত আয় ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। তথ্য বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় ডিএ যেখানে ৫৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেখানে বাংলার কর্মচারীরা পাচ্ছিলেন তার অর্ধেকেরও কম। এই আকাশছোঁয়া বৈষম্য কেবল শতাংশের হারে নয়, বরং কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মানেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের আড়ালে ভোটব্যাংক তুষ্ট করার এই কৌশলে মেধাবী সরকারি কর্মীদের ন্যায়সংগত দাবিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই অগ্রাধিকারের অভাবই আজ রাজ্যকে এক গভীর প্রশাসনিক সংকটে ফেলে দিয়েছে।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর বেতন কাঠামো এবং আর্থিক শৃঙ্খলার সাথে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করলে এক প্রকট ও হতাশাজনক বৈষম্য ধরা পড়ে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা গুজরাটের মতো রাজ্যগুলো কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়ণ করে কর্মচারীদের নিয়মিত কেন্দ্রীয় হারে ডিএ প্রদান করে। একজন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পিজিটি শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান আজ এক ঐতিহাসিক বঞ্চনার নজির। বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রেক্ষাপটে উত্তরপ্রদেশে একজন শিক্ষকের প্রারম্ভিক মোট বেতন যেখানে ডিএ (৫৫%) ও অন্যান্য ভাতা মিলিয়ে প্রায় ৮৫,০০০ থেকে ৯০,০০০ টাকার কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সমপদমর্যাদার একজন শিক্ষক পাচ্ছেন মেরেকেটে ৬০,০০০ থেকে ৬৫,০০০ টাকা। অর্থাৎ, স্রেফ কেন্দ্রীয় হার অনুসরণ না করায় বাংলার একজন শিক্ষক প্রতি মাসে গড়ে ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। মুদ্রাস্ফীতির পারদ যেখানে প্রতি বছর ঊর্ধ্বমুখী, সেখানে বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ ও দক্ষ কর্মচারী গোষ্ঠী এক স্থবির এবং ক্ষয়িস্ফু আর্থিক পরিমণ্ডলে বন্দি হয়ে আছেন, যা প্রকারান্তরে রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসনিক অবনমনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সর্বোচ্চ আদালতের এই ঐতিহাসিক রায় বর্তমান সরকারের আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দেওয়া প্রাক-ভোট ঘোষণা এবং জনমোহিনী বাজেটের জন্য এক মহা-সংকট তৈরি করেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজ্য সরকার যে বিপুল অংকের অনুদান ভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্পের নীল নকশা বুনেছিল, তা এখন প্রায় ৪১,০০০ কোটি টাকার বকেয়া মেটাতে গিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এই বিশাল অংকের আর্থিক দায়বদ্ধতা মেটানোর পর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বর্ধিত বরাদ্দ বা অন্যান্য জনমুখী প্রকল্পের নতুন কিস্তি ছাঁটাই করা ছাড়া সরকারের কাছে আর কোনো সম্মানজনক বিকল্প অবশিষ্ট নেই। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য যে বিপুল জনমোহিনী প্রতিশ্রুতির জাল বিছানো হয়েছিল, আদালতের এই নির্দেশ সেই তাসের ঘরের মতো সৌধকে ধসিয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছে। রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায় যেখানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সেখানে এই বিশাল অংকের দায়বদ্ধতা মেটাতে গেলে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ বা শিল্পায়ন—সবই স্থবির হয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মূলত রাজভাতা বনাম বিধিবদ্ধ ভাতার এই সংঘাত নবান্নের সাজানো নির্বাচনী অঙ্ক এখন সম্পূর্ণ ওলোটপালোট করে দিয়েছে।

পরিশেষে, পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের অন্যতম ঋণগ্রস্ত রাজ্য হিসেবে এক ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের মোট পুঞ্জীভূত ঋণের (Accumulated Debt) পরিমাণ প্রায় ৮.৩ লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি স্পর্শ করতে চলেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত এই বকেয়া মেটানোর পর রাজ্যের মোট ঋণের বোঝা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে যা অদূর ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ঋণ ও জিএসডিপি-র অনুপাত আজ ৩৭.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে অর্থ কমিশন-এর নিরাপদ সীমার অনেক উর্ধ্বে চলে গিয়েছে। সুস্থ অর্থনীতির মাপকাঠি অনুযায়ী যা ২৫ শতাংশের নিচে থাকা বাঞ্ছনীয়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ আজ ঋণের চরম ফাঁদে নিমজ্জিত। ঘোষিত সমস্ত ব্যয়বহুল প্রকল্প বজায় রাখা এবং একই সাথে আদালতের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে রাজ্য এখন সম্পূর্ণ দেউলিয়া হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। মূলত এক দশকের অর্থনৈতিক অদূরদর্শিতার মাশুল আজ গোটা রাজ্যবাসীকে এক চরম রাজকোষীয় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় তটস্থ করে রেখেছে। বাংলার ভবিষ্যৎ আজ এক অনিশ্চিত অন্ধকারের পথে ধাবিত হচ্ছে।

আনন্দপুরে মোমোয় মিশে গেল মানুষ পোড়া গন্ধ

স্বাতী সেনাপতি

আনন্দপুর নিছক কোনও দুর্ঘটনা নয়, অবহেলাও নয়। এটা একপ্রকার 'খুন'। সরকার পারেনা এর দায় ঝেড়ে ফেলতে। আমাদের সহনাগরিকরা জ্যান্ত পুড়ে মারা গেছেন। অন্য রাজ্যে কিছু হলেই শাসকদল বলে "বাঙালিদের উপর অত্যাচার", তাহলে আনন্দপুরে যারা মারা গেলেন তারা কি বাঙালি নন? তারা কি পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক নন?

শীতের সন্ধ্যায় গরম গরম মোমো খেতে দারুণ লাগে তাই না? হালকা করে কামড় দিলেই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ফ্লেভারফুল স্বাদের মাংস কিংবা সবজির পুর। কিন্তু সেই মোমোতেই যদি মিশে যায় মানুষের মাংস পোড়া কটু গন্ধ? কেমন হবে সেটা?

ঠিক এই জিনিসটাই হয়েছে আনন্দপুরে। কলকাতার অন্যতম নামী দামী মোমো ব্র্যান্ডের কারখানায় আগুন লাগে। বাইরে থেকে তালা বন্ধ থাকায় কারখানা থেকে বেরোতে পারেনি শ্রমিকরা। ফলে পুড়ে মৃত্যু হয় প্রায় ২৫ জন শ্রমিকের। নিখোঁজ আরও বহু। এই ঘটনা আরও একবার এই রাজ্য সরকারের উদাসীনতা, গাফিলতি এবং সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ছবিটা সামনে এনে দিল।

এই ভয়াবহ ঘটনা কয়েকটি প্রশ্নের সামনে এনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বছরের পর বছর লাইসেন্স দিল কে? ফায়ার লাইসেন্স যাচাই হলো না কেন? জলাজমি ভরাট করে কীভাবে ফ্যাক্টরি গড়ে উঠল? দমকল, পুরসভা ও প্রশাসন—সবাই কোথায় ছিল?

সারা দেশে ব্যবসা করা কোনও সংস্থা কীভাবে এমন নোংরা ও বিপজ্জনক পরিবেশে খাবার তৈরি করতে পারে? এই ঘটনা না ঘটলে কি আমরা কোনওদিন জানতে পারতাম, কীভাবে সেই খাবার বানানো হয়?

প্রশ্ন উঠছে কলকাতা শহর জুড়ে বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও কেন নির্বিকার প্রশাসন? এই রাজ্যে বর্তমানে ফায়ার সেফটি বা অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার অবস্থাটাই বা কি? আসুন বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

নিয়মিত কমার্শিয়াল এবং রেসিডেনসিয়াল বিল্ডিংগুলির ইন্সপেকশন হয় না, নেই পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা। সিভিক ঠিকা কর্মী দিয়ে কাজ চালানো হয় যাদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হয় না।

রাজ্যে ১৪৪টি দমকল কেন্দ্রে মোট ৯,৪১৫ জন কর্মী থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে সেই সংখ্যক কর্মী নেই। বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, রাজ্যের ২৩টি জেলার প্রতিটিতে এক জন করে ডিভিশনাল অফিসার থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে ওই পদে রয়েছেন মাত্র আট জন। ফলে এক-এক জন ডিভিশনাল আধিকারিককে একাধিক জেলার দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে।

আগুন নেভানোর কাজ করছেন কারা? অক্সিলিয়ারি ফায়ার পার্সোনেলরা;

এককথায়, যাঁরা স্থায়ী কর্মী নন। আরও ভয়ঙ্কর প্রশ্ন হল, যাঁরা এই মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করছেন, তাঁরা কি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন? দমকলে যাদের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়, তাদের ছয় মাস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যাদের অক্সিলিয়ারি ফায়ার পার্সোনেল হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে, তাদের কোনওরকমে এক মাস প্রশিক্ষণ দিয়েই কাজে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রতি মুহূর্তে বিপদ আরও ভয়ঙ্কর হওয়ার আশঙ্কা রয়েই যাচ্ছে।

কর্মীসংখ্যার ঘাটতি পূরণ করতে ওভারটাইম তো করতেই হয়। কখনও দুই ঘন্টা, তো কখনও আবার চার-পাঁচ ঘন্টা। আপনি হয়ত ভাবতেই পারেন, ওভারটাইম করেন তো কী? টাকা তো নিশ্চয়ই পান অতিরিক্ত সময় কাজে। হ্যাঁ, অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য টাকা পান দমকলকর্মী। কিন্তু কত জানেন? ওভারটাইম বাবদ তাঁরা যে টাকা পারিশ্রমিক পান, তা যে কোনও সরকারি কর্মীর ওভারটাইম পারিশ্রমিক হতে পারে, তা হয়ত আপনার কল্পনারও অতীত। কর্মীদের কথায়, ফায়ার অপারেটররা অতিরিক্ত কাজের জন্য ঘন্টাপিছু পান মাত্র ৭ টাকা, লিডাররা পান ৯ টাকা এবং অফিসাররা পান ১২ টাকা করে।

এছাড়াও রাজ্য দমকল বিভাগে ফায়ার অপারেটর নিয়োগে দুর্নীতির কারণে অনেকগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। বীরভূম জেলায় অক্সিলিয়ারি ফায়ার অপারেটর পদে নিয়োগ হওয়া ২৫ জনের চাকরি বাতিল করেছে আদালত। শহরে ৬৫০ টির বেশি ছোট কলকারখানা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অগ্নি নির্বাপণবিধির (Fire Extinguishing Regulations) তোয়াক্কা করছে না

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কলকাতা কার্যত জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে একের পর এক অগ্নিকাণ্ড, প্রাণহানি ঘটলেও টনক নড়েনি প্রশাসনের। কয়েকটা ঘটনা মনে করিয়ে দিই। ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৮৯ জন মানুষের মৃত্যু হয়। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা হাসপাতাল, অসুস্থ রোগীরা বেরোতে না পেরে অসহায়ভাবে ছটফট করতে করতে প্রাণ হারান। ২০১৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মধ্য কলকাতার ক্যানিং স্ট্রিটের বাগরি মার্কেটে ছ'তলা বাড়িতে আগুন লাগে। তিনদিন ধরে তাণ্ডব চালিয়ে গোটা বাজার কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয় এবং বহু মানুষ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েন। এরপর ৮ মার্চ ২০২১ স্ট্র্যান্ড রোডে পূর্ব রেলের অফিসে

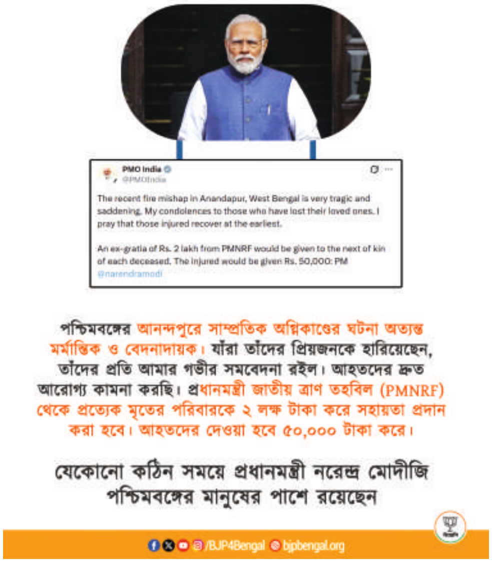

ভয়াবহ আগুন নেভাতে গিয়ে কয়েকজন দমকলকর্মী নিজেরাই আগুনের গ্রাসে প্রাণ হারান। অভিযোগ ওঠে, তাঁদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছিল না। প্রায় ১০ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

১৮ নভেম্বর ২০২২ এসএসকেএম হাসপাতালের জরুরি বিভাগে অগ্নিকাণ্ডে সিটি স্ক্যান মেশিন পুড়ে যায়, ইউএসজি-র যন্ত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বেলগাছিয়ার সেন্ট্রাল ডায়েরিতে মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে গোটা এলাকা, চারপাশ ঢেকে যায় কালো ধোঁয়ায়, ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ আনন্দপুরে সকালে পরপর বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকা, চোখের পলকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে একের পর এক ঝুপড়িতে, একাধিক ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তার পরেও ২৯ এপ্রিল ২০২৪ বড়বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ১০টি দমকল ইঞ্জিন।

এই দীর্ঘ সময়ের ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্ট করে দেয় রাজ্যে নিয়মিত ফায়ার অডিট হয় না, নজরদারি দুর্বল, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা চরমে। বছরের পর বছর ধরে একই ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটে চলেছে, কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন বা কঠোর ব্যবস্থা দেখা যায় না। ফলস্বরূপ বারবার সাধারণ মানুষ ও দমকলকর্মীরাই প্রাণ হারাচ্ছেন, আর দায় এড়িয়ে যাচ্ছে প্রশাসন।

কাজেই আনন্দপুর এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়, এটা নিছক অবহেলাও নয়। প্রশ্ন উঠছে এটা কি একপ্রকার 'পরিকল্পিত খুন, সরকারি আশ্রয়ে খুন' নয়? আমাদের সহনাগরিকরা জ্যান্ত পুড়ে মারা গেছেন। অন্য রাজ্যে কিছু হলেই শাসকদল বলে "বাঙালিদের উপর অত্যাচার", তাহলে আনন্দপুরে যারা মরলেন তারা কি বাঙালি নন? তারা কি পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক নন? ২০১১ সালের পর থেকে যত বস্তি ও ফ্যাক্টরি আগুনে পুড়েছে, তার একটারও কি ন্যায়বিচার হয়েছে? আগুন লাগে, সব শেষ হয়, তারপর সেই জায়গাতেই গজিয়ে ওঠে বড় বড় অট্টালিকা।

আজ বলা হচ্ছে, কয়েকজনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু কয়েকটা টাকার ক্ষতিপূরণ দিলেই কি খুন, অবহেলা আর দুর্নীতি ধুয়ে যায়? মানুষের জীবনের কোনও দাম নেই এটাই কি আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতা? তাই চুপ থাকবেন না, প্রশ্ন করুন। আজ আনন্দপুর, কাল হতে পারে আপনার পাড়া। আর ভোট দেওয়ার সময় মনে রাখবেন কারণ আগামীকাল হয়তো আপনার আত্মীয়ের জীবনের দামও কোনও সরকার ঠিক করে দেবে।

ভোটের ভাঁওতা

নেই রাজ্যের বাজেটে শুধুই বিজ্ঞাপনী চমক

অভিরূপ ঘোষ

বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হলেও বার্ধক্য ভাতার অঙ্কে কোনও বৃদ্ধি ঘোষণা করা হয়নি। যদিও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের উপভোক্তারা ৬০ বছর বয়সে পৌঁছলেই আপনাআপনি বার্ধক্য ভাতার আওতায় চলে যান। অসঙ্গতি ধরিয়ে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি আরজিকর, ল-কলেজ বা সন্দেশখালীর ঘটনার পরেও আমাদের রাজ্যে নারী নিরাপত্তার জন্য বাজেট বরাদ্দ শূন্য।

তৃণমূল মানেই ভাঁওতা আর ভণ্ডামি। মিথ্যা কথায় বিশ্ব রেকর্ড করা এক শাসক যখন রাজ্যের দায়িত্বে তখন বাজেটে সততা থাকবে এ প্রত্যাশা করাই ভুল। পুরো বাজেটে ভাঁওতার এত নিদর্শন আছে যা আলোচনা করতে গেলে একটা গোটা পত্রিকাও কম পড়ে যাবে। তাই খুব সংক্ষেপে মাত্র দশটি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হল।

১। প্রথম সারির বিকিয়ে যাওয়া বাংলা মিডিয়াগুলো প্রচার করছে লক্ষীর ভান্ডারের জন্য ৫০০ টাকা করে বাড়ানো নাকি মমতা ব্যানার্জি সরকারের মাস্টারস্ট্রোক! আজ ভোটের মুখে এসে তৃণমূল সরকার বলছে দেড় হাজার টাকা করে মহিলাদের একাউন্টে দেওয়া হবে। যদিও বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মত বিজেপি শাসিত রাজ্যে অনেক আগে থেকেই মহিলাদের একাউন্টে মাসে ১৫০০ টাকা (কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারও বেশি) করে দেওয়া হয়। দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দেওয়া হচ্ছে আড়াই হাজার টাকা করে।

অন্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের একটা বড় অংশের উপার্জনের অন্য কোন পথ প্রায় খোলা নেই। সেখানে দেড় হাজার টাকায় মাসে কিছুই হয় না।

বিজেপির দাবি ছিল লক্ষীর ভান্ডারের পরিমাণ ন্যূনতম মাসে তিন হাজার টাকা করার। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষীস্বরূপা মা এবং মেয়েরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে কয়েক মাস পর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার এলে এর থেকে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা তাঁরা পাবেন। সাথে পাবেন নিরাপত্তা,সম্মান এবং মর্যাদা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি আরজিকর, ল-কলেজ বা সন্দেশখালীর ঘটনার পরেও আমাদের রাজ্যে নারী নিরাপত্তার জন্য বাজেট বরাদ্দ শূন্য।

২। এবারের বাজেটে নতুন চমক হিসেবে মাধ্যমিক পাস যুবকদের জন্য প্রতি মাসে দেড়হাজার টাকা করে (যে টাকায় সংসার চালানো শুধু কঠিন নয় অসম্ভবও বটে) বেকার ভাতা ঘোষণা করেছে তৃণমূল সরকার। এটাও বলা হয়েছে এবছর ১৫ আগস্ট থেকে নাকি এই প্রকল্প চালু হবে। প্রথমত ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখে পেশ হওয়া বাজেট পূর্ণাঙ্গ নয়, এটা ভোট অন একাউন্ট, অর্থাৎ এপ্রিল থেকে তিন চার মাসের জন্য খরচের হিসাবপত্র। সেখানে আগস্ট থেকে চালু হওয়া কোন প্রকল্পের ঘোষণা এই বাজেটে হতেই পারে না। যদি সত্যি সত্যিই মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছে থাকতো বেকার যুবকদের দেড় হাজার টাকা করে দেবার, তাহলে বর্ধিত লক্ষীর ভান্ডার যেরকম ফেব্রুয়ারি থেকে চালু হচ্ছিল তেমনি বেকার ভাতাও ফেব্রুয়ারি থেকে দেওয়া যেত। কিন্তু সেটা করা হয়নি। হয়নি কারণ মুখ্যমন্ত্রী জানেন আগস্ট মাসে তিনি ক্ষমতায় থাকবেন না।

আর তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার এবং পরিযায়ী শ্রমিক মিলে যে তিন কোটি (প্রায়) যুবক রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দিতে গেলে এক অর্থবর্ষে লাগে প্রায় ৫৪০০০ কোটি টাকা। সেখানে বাজেটে বরাদ্দ ৫০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ ওই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যা অর্থের প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট

বিজ্ঞান চর্চা খাতে বরাদ্দ ৮২ কোটি টাকা

আইটি খাতে বরাদ্দ ২১৭ কোটি টাকা

মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ৫১৮০ কোটি টাকা

এর থেকে স্পষ্ট হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের বদলে মৌলবী,আলেম তৈরী করায় বিশেষ আগ্রহী

তার দশ ভাগের এক ভাগও বরাদ্দ করা হয়নি।

সব থেকে বড় কথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত যুবক কাজ চায়। শিল্প চায়। দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ চায়। ব্যবসার জন্য ভয়হীন উপযুক্ত পরিবেশ চায়। এগুলির কোনোটিই বর্তমান তৃণমূল সরকার দিতে পারেনি। নতুন বাংলা নববর্ষে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে নিশ্চিতভাবে শিক্ষিত যুবক কাজ পাবে। শিল্প হবে আর সৎভাবে দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগও হবে।

৩। এবারের বাজেটের অন্য এক ভাঁওতা হল তথাকথিত 'খাদ্যসাথী' নামক প্রকল্প। রাজ্য সরকার বলছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে নয় কোটি মানুষকে নাকি বিনা পয়সার রেশন দেয় তারা! রাজ্য বিজেপি বারবার বলেছে এটা কেন্দ্রের প্রকল্প যা রাজ্য সরকার নিজের নামে চালাতে চাইছে। আর রাজ্য বিজেপির এই দাবির প্রমান মেলে এবারের বাজেট ডকুমেন্টে।

মোটামুটি ভাবে ধারণা করা যায় যে নয় কোটি মানুষকে রেশন দিতে মোটামুটি ৫০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা গোটা বছরে। এর সাথে যুক্ত হবে পরিবহনের খরচ, ডিলারের কমিশন, গোডাউনের খরচ ইত্যাদি। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে খরচের পরিমাণ ৭০ থেকে ৮০ হাজার কোটি টাকার কম কোনোভাবেই হতে পারে না। সেখানে এই বাজেটে খাদ্য এবং সরবরাহ বিভাগের জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১০৪০৮ কোটি টাকা! আসলে কেন্দ্রের প্রকল্পকে রাজ্যের নামে চালানোর এই ভন্ডামি দীর্ঘদিনের। এবারের বাজেটও তার ব্যতিক্রম নয়। 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'কে 'পথশ্রী' নাম দিয়ে বা আবাস যোজনার ঘরকে বাংলার বাড়ি নাম দিয়ে বা 'জল জীবন মিশনে'কে 'জলস্বপ্ন' নাম দিয়ে সেগুলোর সাফল্যের কৃতিত্ব বাজেট ভাষণের শুরুতেই দাবি করতে একটুও ইতস্তত বোধ করেনি রাজ্য সরকার।

কোম্পানির নাম	পলায়ন
গ্রীনপ্যানেল ইন্ডাস্ট্রিজ	2025
ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	2024
বাটা ইন্ডিয়া	2024
নেটওয়েব টেকনোলজিস ইন্ডিয়া লিমিটেড	2022
ইউরেকা ফোর্বস লিমিটেড	2021
অ্যাসোসিয়েটেড অ্যালকোহলস অ্যান্ড ব্রিউয়ারিজ লিমিটেড	2020
ম্যাগেলানিক ক্লাউড লিমিটেড	2019
গ্যালান্ট ইস্পাত লিমিটেড	2019
গ্রেটেক্স কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড	2016
জে কে টায়ার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	2014
ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ডিয়া) লিমিটেড	2013
টাটা মোটরস	2008

৪। আসা যাক কর্মচারীদের বেতন প্রসঙ্গে। বাজেট ঘোষণার ঘন্টা চারেক আগেই সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জানিয়ে দেয় রাজ্যের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ এক্ষুনি মিটিয়ে দিতে হবে। তারপরেও রাজ্য বাজেটে দেখা গেল কর্মচারীদের বকেয়া মেটানোর জন্য কোনোরকম অর্থের সংস্থান রাখাই হয় নি। সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা হলো বটে তবে কে তার চেয়ারম্যান, কে তার সদস্য, আর কবেই তার রিপোর্ট পাওয়া যাবে তা কোথাও বলা হল না।

এদিকে আবার সিভিক ভলান্টিয়ার, প্যারা টিচার, আইসিডিএস কর্মীদের

সাম্মানিক বৃদ্ধি করা হয়েছে এক হাজার টাকা করে, যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম। এই চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী পদগুলিতে গোটা দেশের মধ্যে সব থেকে কম বেতন দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৫। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করলেন ৯২০ কোটি টাকা। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ৮১০ কোটি টাকা। উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ১২৩৪ কোটি টাকা। সেখানে সংখ্যালঘু এবং মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ৫৭১৩ কোটি টাকা! অর্থাৎ ইঙ্গিত স্পষ্ট। উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল তথা পশ্চিমাঞ্চলের থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সংখ্যালঘু এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলের জন্য বরাদ্দ প্রায় কিছুই বাড়েনি। উল্টে সংখ্যালঘু এবং মাদ্রাসা শিক্ষাবিভাগের জন্য বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় পনেরো গুন। হ্যাঁ, পনেরো গুন।

৬। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দ করেছে ১০,৪৬৩ কোটি টাকার মত। কথায় কথায় যে গুজরাটকে গালাগালি দেন মাননীয়া সেখানে কৃষি বাজেট এ বছর ২২ হাজার কোটি টাকার বেশি। আমাদের পাশের রাজ্য উড়িষ্যায় সেটা ৩৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি। পশ্চিমবঙ্গ কৃষি প্রধান রাজ্য, তার পরেও বাজেট এতটা কম। সেখানে গুজরাট শিল্পপ্রধান এবং ওড়িশা অর্থনীতির একটা বড় অংশ আছে খনিজ পদার্থ থেকে। আর হ্যাঁ, গুজরাট এবং উড়িষ্যার জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অর্ধেক।

৭। প্রায়ই শিল্প সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন রাজ্যে নাকি ব্যাপক বিনিয়োগ হচ্ছে। মাঝেমধ্যে আবার বিদেশে গিয়ে এরকম ঘোষণা করেন তিনি। বিনিয়োগ যদিও কারুর চোখে পড়ে না। আর শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে একেবারে শেষের সারিতে তার ইঙ্গিত আছে বাজেটেই। ইন্ডাস্ট্রি এবং কমার্স বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট এ বছর ১৪০০ কোটি টাকা। ভারতের যে কোন মাঝারি বা বড় রাজ্যের এক্ষেত্রে বাজেট অনেকটাই বেশি হয়। হরিয়ানার মতো ছোট্ট একটা রাজ্যের বাজেট প্রায় দু হাজার কোটি টাকা হয় শিল্প এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে। ঠিক এই কারণেই ২০১১ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত মোট ৬৬৮৮ টি কোম্পানি এ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে। গেছে কোথায়! গেছে মহারাষ্ট্র (১৩০৮ টি কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে এখানে এসেছে), দিল্লি (১২৯৭), উত্তরপ্রদেশ (৮৭৯), ছত্রিশগড় (৫১১) এবং গুজরাটের (৪২৩) মত রাজ্যে।

৮। মাঝেমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন পশ্চিমবঙ্গে নাকি অনেক আইটি হাব হয়েছে। তো এই আইটি ফিল্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট বরাদ্দ ২১৭ কোটি টাকা। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্রের জন্য এই ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ প্রায় ২০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি হয়। শোনা যায় উত্তরপ্রদেশ সরকার নাকি তেত্রিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে আইটি সেক্টরে। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, নয়ডা বা পুনে কেন এগিয়ে যাচ্ছে আইটি সেক্টরে আর কলকাতা কেন পিছিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

৯। এছাড়া রয়েছে গিগ ওয়ার্কারদের (অর্থাৎ যারা ডেলিভারির কাজ করে) জন্যে স্বাস্থ্যসাথীর মতো সামাজিক সুরক্ষার ভাঁওতা। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যে প্রায় অচল এবং আয়ুষ্মান ভারতকে এ রাজ্যে ঢুকতে না দেওয়া যে মমতা ব্যানার্জির অন্যতম বড় ভুল তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। আর তাছাড়া তৃণমূল যখন নিজেরাই বলছে যে এ রাজ্যে সবাই স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পায় সেখানে

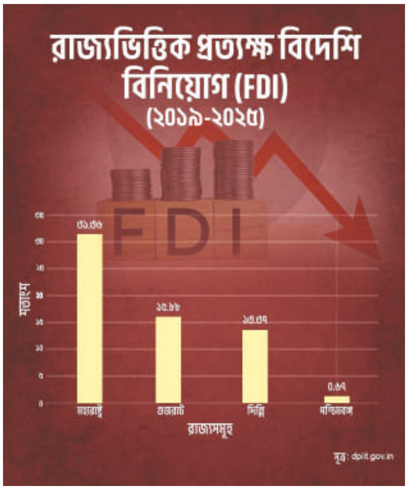

আলাদা ভাবে গিগ ওয়ার্কারদের কোন ধরনের স্বাস্থ্যসাথী দেওয়া হবে তা ঈশ্বরও বোধহয় জানেন না!

১০। বাজেটে রয়েছে ১০০ দিনের কাজ সম্পর্কিত মিথ্যে দাবিও। ব্যাপক দুর্নীতির কারণে কেন্দ্রীয় অনুদান সাময়িকভাবে বন্ধ হবার পর দাবি করা হচ্ছে রাজ্য সরকার নিজেই নাকি সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারের ১০০ দিনের কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। ঘটনা হলো রাজ্যের সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারকে ১০০ দিন করে কাজ দিতে গেলে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। সেখানে রাজ্যের বরাদ্দ মাত্র দু' হাজার কোটি টাকা। এখান থেকে দুটো সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এক, কেন্দ্রের প্রকল্পকে নিজের নাম দিয়ে চালাচ্ছে রাজ্য। দুই, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তৃণমূল।

বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা অনেকে বলছেন এ এমন বাজেট যেখানে পরিকাঠামোর কথা নেই, কর্মসংস্থানের কথা নেই, ভবিষ্যতের কোন দিশা নেই। যদিও এসব জিনিস বাজেটে থাকবে এ প্রত্যাশা দূরদূরান্ত অব্দি কেউ কোনদিনই তৃণমূলের থেকে প্রত্যাশা করে না। শেষ ১৪ বছর ধরে 'মিথ্যা প্রতিশ্রুতি', 'দিশাহীনতা' এবং 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ভুয়ো তত্ত্ব' এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছে বাজেট ভাষণের। তৃণমূল সরকারের শেষ বাজেটও সেই ট্র্যাডিশন থেকে বেরোতে পারল না।

পদ্মশ্রী ডঃ নারায়ণ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গে এখন শুধু শিক্ষার শবদেহটা পড়ে আছে

অকপট সাক্ষাৎকারে জানালেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ নারায়ণ চক্রবর্তী

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসাবে প্রথম প্রশ্ন আপনাকে করব শিক্ষা নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আপনার কি অভিমত?

উত্তরঃ এটা কি শিক্ষা ব্যবস্থা? পশ্চিমবঙ্গে যেটা আছে সেটা তো আমার মনে হয়...শিক্ষার শ্মশানযাত্রা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন খালি শিক্ষা ব্যবস্থার শবদেহটা পড়ে আছে।

প্রশ্নঃ এই যে এসএসসি সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি স্কুল সার্ভিস নিয়ে এ নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া?

উত্তরঃ এটা তো যাকে বলা যায় পৃথিবীতে অভূতপূর্ব। প্রথমে আমাদের অশ্রুতপূর্ব ছিল। তারপর দেখা গেল অভূতপূর্ব। শিক্ষাকর্মী নিয়োগে এবং শিক্ষক নিয়োগে একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে কাটমানি! টাকা দিয়ে, ব্যক্তিগত ঘুষ দিয়ে যে শিক্ষক হওয়া যায় সেটা পশ্চিমবঙ্গ সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে।

একজন উচ্চ আদালতের বিচারকের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করতে পারি। যিনি বলছেন, 'ক্লাস এইট পাশ লোক ক্লাশ টুয়েলভ-এর ক্লাশ নিচ্ছে'! এটা কি করে সম্ভব? এই তো শিক্ষাব্যবস্থা। এই জন্যই বললাম যে শিক্ষার শবদেহটা পড়ে আছে এখন। শিক্ষাব্যবস্থায় কোনও কিছুই আর বাকী নেই। যেখান থেকে পারে সেখান থেকে টাকা নিয়েছে।

আর একটা বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেছে। বারবার করে এটা সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে। সবচেয়ে বেশী যে কাজে কাটমানি পাওয়া যায় সেটা কন্সট্রাকশন। সেজন্য আমাদের মাননীয়া যার অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ চলে, যার অনুপ্রেরণাই হচ্ছে রাজ্যের আইন, রাজ্যের সংবিধান। ভারতীয় সংবিধান এখানে চলেনা, অনুপ্রেরণা সংবিধান চলে। যেটা সামনে রেখে উনি বিভিন্ন স্কুল-কলেজ প্রলিফারেশন (দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি) করেছেন। কেমন সেটা?

যখন সারা ভারতবর্ষে, বোধহয় ১৯টা না ২৩টা আইআইটি ছিল তখন উনি স্টেটমেন্ট দিলেন যে আমি ২০০টি আইআইটি খুলে দিয়েছি। আসলে খুলেছেন উনি আইটিআই। আইটিআই-এর বিল্ডিং করেছেন। তা এমনই আমাদের মাননীয়া, যার অনুপ্রেরণায় শিক্ষামন্ত্রী অনুপ্রাণিত শিক্ষা দফতর চালাচ্ছেন, তিনি আইআইটি আর আইটিআই-এর পার্থক্যটা জানেন না। এবং এগুলোতেও ছাত্র নেই কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো এবং বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে সকলে চাকরি পাচ্ছেনা। সকলের কর্মসংস্থান হচ্ছেনা। এমত অবস্থায় আইটিআই-এর ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থান তো আরও দুরূহ হয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও তিনি ইম্পোজিং বিল্ডিং করেছেন কারণ জনতা বলে এখানে নাকি ৬০ শতাংশ অবধি কাটমানি পাওয়া যায় কন্সট্রাকশনে। যেটা অন্য জায়গায় পাওয়া যাবেনা এবং এই যে তিনি বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গন খুলেছেন সেখানে কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বালাই নেই। শিক্ষক নেই এবং যেখানে আছে সেখানে এইট পাশ শিক্ষক ক্লাস টুয়েলভ-এর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা।

একমাত্র তার পারিষদ, তার ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত সম্পত্তি বাড়ানো অ্যাট দ্য কস্ট অফ জনসাধারণ, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ। বিভিন্ন দফতরকে ফ্রিজ করে পুরো টাকাটা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, এই দুটো স্তম্ভকে নির্ভর করেই কোনও একটি রাজ্যের মানুষ এগিয়ে যায় এবং তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই দুটোকেই উনি কিন্তু ক্যাটিগরিক্যালি, দায়িত্ব নিয়ে অনুপ্রাণিতভাবে তার চ্যালা চামুন্ডাদের দিয়ে পুরো বিনষ্ট করে দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ স্কুল এডুকেশনের সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক্যাল এডুকেশন নিয়েও বললেন। আপনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা (হায়ার এডুকেশন)-এর সঙ্গে যুক্ত। তো উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা যদি বলেন- কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে?

উত্তরঃ আমরা যখন কর্মজীবন শুরু করেছিলাম সেই ১৯৭৭-৭৮ সালে তখন বামফ্রন্ট চলে এল। ৮০-৮১ থেকে তাদের যে দৃঢ়বন্ধন তাতে চিরকুটে চাকরি পাওয়া অধ্যাপক, আলিমুদ্দিন থেকে নাম আসা অধ্যাপক- এসব আমরা দেখেছি। যে অধ্যাপকদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল তাদের ইজমে (পার্টি মতাদর্শ) দীক্ষিত করা এবং পড়ানোটা ছিল তাদের সেকেন্ডারি। কিন্তু তারা কাজে আসতো মাঝেসাঝে। তবে শিক্ষাব্যবস্থাটা একটা বিশাল এডিফিস (গৌরবময় অট্টালিকা)। সেটা পুরোপুরি ভাঙা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের অবদান অগ্রণী।

উচ্চশিক্ষার কথা বললে আমি বলি যে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন যে বিশ্ববিদ্যালয় সেটা কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেই জায়গা থেকে অবস্থাটার দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগলো ২০১১ সালের পর থেকে। তখন কিন্তু একমাত্র চাটুকারিতা এবং অবশ্যই ওইসব অন্যরকম কনসিডারেশনে চাকরিবাকরি পেতে লাগল লোকজন। এমনও এক অধ্যাপিকাকে আমরা জানি যার মর্যালিটি নিয়ে ভারতীয় সমাজের স্ট্যান্ডার্ডে প্রশ্ন তোলা যায়। সেই অধ্যাপিকাও কিন্তু শাসকদলের নেত্রী হিসাবে, একজন শিক্ষিকা এবং ভারপ্রাপ্ত একজন আধিকারিক হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি অবশ্য একাধিক পরিবারের ঘর ভেঙেছে এবং অবশ্যই আমাদের অনুপ্রেরণা দিদিমণির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

আমি বহু উদাহরণ দিতে পারি যে সব অধ্যাপকদের একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে চাটুকারিতা এবং তারা চাকরি করছে। আর একটা জিনিস যেটা এরা করেছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রোমোশনে যে যোগ্যতা তাকে সম্পূর্ণভাবে ভায়োলেট করা। এভাবে বিভিন্ন লোকেদের বিভিন্ন দফতরে মানে শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই উচ্চশিক্ষা দফতরের প্রায় আধ ডজন আধিকারিকের, টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগের কারণে জেলযাত্রা। ভাইস চ্যান্সেলরকেও জেল খাটতে হচ্ছে। আমি এমন ভাইস চ্যান্সেলরকেও জানি যাকে বিশুদ্ধ বাংলা বা ইংরাজিতে একপাতা চিঠি লিখতে বললে পারবেন না। নাম করে এখানে বলে কি হবে? আমাকে যদি চার্জ করা হয় তাহলে আমি সেগুলো প্রমাণ সহযোগে দেখিয়ে দিতে পারি। সেই ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের আচার্যের নির্দেশে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই তিনিই আবার অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে গেলেন। এভাবেই সব চলছে।

একমাত্র অনুপ্রাণিত মানুষজন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দফতরের আর কিছু অস্তিত্ব নেই এবং পুরো ব্যাপারটাই অনুপ্রেরণার অঙ্গুলিহেলনে চলে। টাকাপয়সা রোজগার করা এবং শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রা সম্পন্ন করা।

এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আগে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চস্তরের গবেষণার কাজ হত এবং রাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে নামী যেসব ছাত্রছাত্রীরা বের হত সেই সংখ্যাটা কিন্তু অনেক কমে গেছে। আমাদের সময়েও প্রতি বছরেই বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করা ছাত্রছাত্রী আমরা তৈরি করেছি কিন্তু সেই যুগ এখন আর নেই।

আর একটা গুরুত্বপূর্ন কথা হচ্ছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এমনকি যেগুলো চালু বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোকেও অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার এমনকি মেইন্টেনেন্সের টাকাটাও ঠিকমত দেওয়া হয়না। এবং এই অনুপ্রেরণাড় একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিপার্টমেন্টটা লুঠ করে নেওয়া। তার একটা ক্লাসিক উদাহরণ হল- বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি। বিশ্বভারতীর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ কিমির মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তিনি তৈরি করলেন। ইউরোপ-আমেরিকায় যেমন দেখেছি সব বড় বড় ভিলেজ, পাঁচ তারা রিসর্ট- ঠিক সেইরকভাবে ওই ওখানে সব বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। এই বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ওখানে কটা ছাত্র, কটা ডিপার্টমেন্ট বা তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি তার কিছুই জানিনা। এই বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে কে বলেছিল? কেন খোলা হয়েছিল? কি উদ্দেশ্যে? উদ্দেশ্য একটাই। কাটমানি নিয়ে পকেটে পোরো এবং সরকারি কোষাগারকে ফাঁক করে দাও। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াও।

প্রশ্নঃ আপনি পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশের একজন বিশিষ্ট মানুষ। এ রাজ্যের বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার নিয়মিত কথাবার্তা হয়। তো তাঁরা কি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তন চাইছেন?

উত্তরঃ বাঙালীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। সোজা মেরুদণ্ডের মানুষ যেমন আছে, শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রচুর আছেন। আবার এমনও শিক্ষাবিদ আমি দেখেছি যিনি পরে ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। প্রচুর কমিটিতেও ছিলেন। বামফ্রন্টের ঘনিষ্ঠ বলব না, বামফ্রন্টের এক পিলার। সেই তিনি ভুল ইংরিজিতে ডিপার্টমেন্টে নোটিশ দিতেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। নাম করে আর এদের এই বয়সে অপদস্থ করে কি হবে! আমি তখন ছাত্র ছিলাম। উনি তখন অধ্যাপক। তিনি আবার মাতৃভাষায় পড়া-র খুব পক্ষপাতী ছিলেন। ভাল কথা। কিন্তু মাতৃভাষার ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকলে কি করে আর পড়াবে! তো এই ধরনের কিছু শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী গজিয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এইরকম বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ তৈরি করত যারা বাজারে ১০০ শতাংশ রিডাকশন সেল-এ বিক্রি হয়েছে। এমন শিক্ষাবিদদের নামও আমি জানি। সিপিএম-এর সময় লাল জামা পরতেন, এখন সবুজ জামা পরছেন। তো এই শিক্ষাবিদদের আমি শিক্ষাবিদ বা বুদ্ধিজীবী বলিনা। এরা প্রবুদ্ধজন নয়। শিক্ষাজীবী বলতে পারো। শিক্ষা থেকে তাঁরা অর্থ উপার্জন করেন।

তবে মেরুদণ্ড সোজা- প্রচুর শিক্ষাবিদ ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উপাচার্য, সিপিএম-এর সঙ্গে বলা ভাল বামফ্রন্টের সঙ্গে না বলে, ৪ বছর লড়াই করেছিলেন প্রচণ্ডভাবে তিনি সন্তোষ ভট্টাচার্য। তার থেকে যদি শুরু করি, সেরকম সোজা মেরুদণ্ডের আমি প্রচুর শিক্ষাবিদ দেখেছি। সুনন্দ সান্যালকে দেখেছি। পরবর্তীকালে আরও অনেকের নাম করতে পারি। অনেকের সঙ্গেই আমার সবিশেষ পরিচিতি আছে। এরা কিন্তু একটা অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে আছেন। এখন আমাদের হাত রুদ্ধ, বক্তব্য রুদ্ধ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেখানে শিক্ষার কোনও সম্মান নেই। 'যত বেশী জানে তত কম মানে'- এই স্লোগানটা সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হওয়ার জায়গা এখানে।

এরা এত বিদ্বান যে তা নিয়ে কিছু বলার নেই। আমাদের অনুপ্রেরণা দিদি সেই যে সরস্বতীর মন্ত্র বলেছিলেন সেটা বলে আর আমি লোক হাসাতে চাইনা। কিছুদিন আগে তিনি তো নজরুলকে দিয়ে রামায়ণও লিখিয়েছিলেন। তারপরে পারিবারিকভাবে ঘোষিত তার যে উত্তরাধিকারী পশ্চিমবঙ্গের সিংহাসনের, সে তো রামমোহন রায় নিয়ে বলতে গিয়ে বললেন যে রামমোহন নাকি 'পতিদাহ' প্রথার জন্য বিখ্যাত। সতীদাহ নয়! আবার তার পিসিমণি বলেছিলেন, সতীদাহ নাকি বন্ধ করেছিলেন বিদ্যাসাগর।

তো এই ধরনের যাদের জ্ঞান, তাদের দ্বারা সার্টিফায়েড যেসব শিক্ষাবিদ আছেন, তাদেরকে তো আমি বললাম শিক্ষাজীবী বলতে পারি। শিক্ষাবিদ নয়। সাধারণ যে প্রবুদ্ধজন-শিক্ষাবিদ তাঁরা এখন কায়মনোবাক্যে, যে ভগবানেই বিশ্বাস করুন না কেন প্রার্থনা করছেন- কবে এই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাবো।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অমূল্য সময় দেওয়ার জন্য। ভাল থাকবেন। প্রণাম।

ছবিতে খবর

শিলিগুড়ি বিভাগ কার্যকর্তা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহাশয় সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব এবং বিজেপি কর্মীবৃন্দ।

উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগ কার্যকর্তা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহাশয় সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব এবং বিজেপি কর্মীবৃন্দ।

বর্ধমান বিভাগ কার্যকর্তা সম্মেলনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন মহাশয় সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব এবং বিজেপি কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন মহাশয়ের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব।

কলকাতায় লাভার্থী সম্পর্ক অভিযান কর্মশালাতে
রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বগণ।

কলকাতায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর সামাজিক সম্মেলনে
শ্রী রাহুল সিনহা সহ অন্যান্য রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বগণ।

কাশীপুর বেলগাছিয়াতে বিজেপি কার্যকর্তাদের সাথে বসে
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনছেন
রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

আনন্দপুরে সহ-নাগরিকদের অকাল মৃত্যুর প্রতিবাদে বিজেপি
যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন
থেকে নরেন্দ্রপুর থানা পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলে
বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ছবিতে খবর

শ্যামাপ্রসাদ অভিযান রাষ্ট্র কল্যাণ ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

কলকাতা উত্তর শহরতলী জেলার, উত্তর দমদম ১ নং মণ্ডলে বুথ বিজয় কর্মশালা অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় জনবার্তা ১৩৬ নং স্টলে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেন বিজেপি রাজ্য দপ্তরে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববৃন্দের।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলাশাসকের সঙ্গে তৃণমূল-আইপ্যাক যোগসাজশে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারকে হয়রানির বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে জেলায় জেলায় জেলাশাসকের কার্যালয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জেলা নেতৃত্ব এবং বিজেপি কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

দার্জিলিংয়ে মহা কার্যকর্তা সম্মেলনে সাংসদ রাজু বিস্তা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সহ পর্যবেক্ষক শ্রী বিপ্লব দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

বিজেপি হাওড়া (গ্রামীণ) সাংগঠনিক জেলার ডাকে বাগনানে পরিবর্তন সংকল্প সভায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভায় মানুষের ঢল।

বিজেপি বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে বহরমপুর মোহনা বাসস্ট্যান্ডে 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

বিজেপি নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার ডাকে ভালুকা রথতলা ময়দানে 'পরিবর্তন সংকল্প সভায়' কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ডাকে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভার বাগডোগরা সন্তোষী মা-এর মন্দির ময়দানে 'পরিবর্তন সংকল্প সভায়' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

ওন্দার বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে তালা বন্ধ করে পুড়িয়ে মারার চক্রান্তের প্রতিবাদে ওন্দা বিধানসভায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

রামপুরহাট বিধানসভা কার্যকর্তা সম্মেলনে রাজ্য বিজেপি সহ সভাপতি শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেন বিজেপি রাজ্য দফতরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববৃন্দের।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় জনবার্তা ১৩৬ নং স্টলে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী ও অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব।

বোলপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে কেতুগ্রাম,পাঁচুন্দি বাসস্ট্যান্ডে 'পরিবর্তন সংকল্প সভায়' বিজেপি কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

নীতিন নবীন - বিজেপিতে নতুন প্রজন্মের সূচনা

বিজেপিতে নেতা তৈরি হয়, উত্তরাধিকার নয়

সৌভিক দত্ত

নীতিন নবীনের মতো একজন তরুণের সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়া কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় - এটা একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক দর্শনের ফল। যেখানে নেতৃত্ব আসে যোগ্যতা থেকে, যেখানে 'বস' বদলায় কিন্তু ব্যবস্থা ভাঙে না, যেখানে প্রধানমন্ত্রীও নির্দ্বিধায় সভাপতির নেতৃত্ব মেনে নেন জনসমক্ষে।

ভারতের রাজনীতিতে যে কয়েকটি ত্রুটি আছে তাদের মধ্যে অন্যতম দুটো বলা যায় - পরিবারতন্ত্র আর বৃদ্ধতন্ত্র। পরিবারতন্ত্র নিয়ে তো কিছু বলারই নেই, প্রায় অর্ধশত রাজনৈতিক দল ভারতে আছে যেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা কখনোই নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবারের বাইরে যায় না। বস্তুত সেগুলো কোনো রাজনৈতিক দলই না, খুব স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক আদর্শের ছিটেফোঁটা থাকে না সেসব দলের মধ্যে। যেখানে পরিবার'ই পার্টি, সেখানে আদর্শ শুধু পোস্টার। তারা মূলত এক একটা 'তোলাবাজ' শিবির হয় যেখানে উপার্জনের বিনিময়ে সবাই সর্বোচ্চ পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। অসংখ্য উদাহরণ আছে ভারতে। বরং বলা যায় যদি জাতীয় স্তরে বিজেপির উত্থান না ঘটত তাহলে সারা পৃথিবীতে ভারত পরিচিতই থাকত পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির দেশ বলে।

আর দ্বিতীয় হল বৃদ্ধতন্ত্র। বৃদ্ধ হয়ে বৌদ্ধিক ও শারীরিকভাবে অথর্ব হয়ে পড়লেও নিজে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার বা নতুন প্রজন্মকে ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ স্তরে তুলে আনার সদিচ্ছা দেখাতে পারেনা কেউই। পশ্চিমবঙ্গ বা কেরল ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের ইঙ্গিত করে তো বলাই হয় যে তারা দেহত্যাগের আগে নাকি পদত্যাগ করে না। সমস্যাটা কারো পথ ছাড়া বা ধরে থাকা নিয়ে নয়, সমস্যাটা হলো

নতুনদের উঠতে না দেওয়া নিয়ে। কারণ নতুন জেনারেশনই সবসময় মুক্ত ভাবনাচিন্তার বাতাস নিয়ে আসে। একটা বয়সের পর মানুষ নতুনভাবে ভাবতে ভুলে যায়। তখন সে হয়তো অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয় কিন্তু গঠনমূলক ভাবনাচিন্তায় হয় দীন-হীন। ফলে সেই বৃদ্ধ নেতারা নিজের দল তথা পুরো দেশকেই স্রোতহীন বদ্ধ জলাশয় বানিয়ে ফেলে। তাদের সিদ্ধান্ত আসে ১৯৭৫-এর মানসিকতা থেকে, অথচ দেশ ২০২৬-এর। এই দুটো সমস্যা ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের একটি জলজ্যান্ত সমস্যা।

আর সেখানে দাঁড়িয়েই যেন পরিবারতন্ত্র আর বৃদ্ধতন্ত্রর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। শুধু ভারত কেন, সমগ্র উপমহাদেশের রাজনীতিতেই এ যেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। যেখানে নেতা উঠে আসে মাটি থেকে, সেখানে যোগ্যদের জন্য সবসময় আসন তৈরি থাকে, নতুন জেনারেশনকে সবসময় এগিয়ে রাখা হয় আর কোনো পারিবারিক মাফিয়া তন্ত্র? প্রশ্নই ওঠে না। বিজেপিতে নেতা তৈরি হয়, উত্তরাধিকার নয়। আর এরই একদম সঠিক উদাহরণ হলো - বিজেপিতে সভাপতি পদে নীতিন নবীনের নিয়োগ। মাত্র ৪৫ বছর বয়সের এই তরুণ তুর্কি আজ বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলটির সভাপতি পদে বসে জাতীয় রাজনীতিতে এক নতুন আলোড়ন এনেছেন।

এর আগে শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা ছিলেন সভাপতির দায়িত্বে। সভাপতি হওয়ার আগে তিনি মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসার পরে নাড্ডাকে আবার মন্ত্রিসভায় ফেরানো হয়। একই সঙ্গে রাজ্যসভায় তাঁকে বিজেপির দলনেতাও করা হয়েছে। তাই সভাপতি পদে নতুন মুখ প্রয়োজন ছিল। সেই রাস্তাতেই উঠে আসেন শ্রী নবীন। প্রথমে কিছুদিন তাকে কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারপর ২০ জানুয়ারি ২০২৬ নীতিন নবীনকে বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় (জাতীয়) সভাপতি হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

২৩ মে ১৯৮০ সালে রাঁচিতে জন্মানো এই যুবা নেতার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ছাত্রাবস্থা থেকেই। ছাত্র রাজনীতি থেকেই ধীরে ধীরে তিনি নিজের পরিচিতি তৈরী করে নেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা পাটনার সেন্ট মাইকেল হাই স্কুলে সম্পন্ন হয়, যেখান থেকে তিনি ১৯৯৬ সালে সিবিএসই দশম শ্রেণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি নয়াদিল্লির সিএসকেএম পাবলিক স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৮ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি শ্রীমতী দীপমালা শ্রীবাস্তবের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এই দম্পতির দুটি সন্তান - এক ছেলে এবং এক মেয়ে।

খুব অল্প বয়সেই শ্রী নবীন রাজনৈতিক দায়িত্ব অর্জন করেন। ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি বিহার প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি ছিলেন। ২০০৬-এ পাটনা ওয়েস্ট উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি। ২০১০ সাল থেকে, তিনি

বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টানা নির্বাচিত হয়ে ২০১০, ২০১৫, ২০২০ এবং ২০২৫ সালে জয়লাভ করে পরপর পাঁচবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। বিহার সরকারেরও নানা দায়িত্ব তিনি সামলেছেন বিভিন্ন সময়ে। রাস্তা নির্মাণ, শহর উন্নয়ন ও হাউজিং মন্ত্রী, আইন ও ন্যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি নিজের কর্মদক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন।

তবে একজন দক্ষ মন্ত্রীর পাশাপাশি তিনি একজন অসাধারণ সংগঠকও। সাংগঠনিক জীবনে তিনি রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলেছেন। সিকিম ও ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলিতেও তাকে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষত বিজেপির ছত্তিশগড় বিজয়ে তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই রাজ্য নিয়ে কংগ্রেস তো অবশ্যই, অনেক রাজনৈতিক সমালোচকই নিশ্চিত ছিল যে কংগ্রেস জিতে যাবে। কিন্তু তৈরী থাকে। যাতে এক প্রজন্ম দায়িত্ব ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্ম দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারে। নেতৃত্বের যাতে সংকট তৈরি না হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মনোহর পারিক্কর বা সুষমা স্বরাজের মতন জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের মৃত্যুর পরেও বিজেপিতে তাদের অবর্তমানে কোনো ক্ষতি হয়নি কারণ রিজার্ভ বেঞ্চ তৈরি করা ছিল। এখন বর্তমান নেতৃত্বের পরে দ্বিতীয় প্রজন্ম এবং তৃতীয় প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরির দিকে মন দিয়েছে বিজেপি। আর তাদের এই মানসিকতাই প্রমাণ করে যে কেন আগামী অন্তত ২০ বছরে জাতীয় স্তরে বিজেপির বিকল্প কোনো দল হতে পারবে না।

এখানে আরও একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। নীতিন নবীনের দায়িত্ব গ্রহণের দিন শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিজেপিতে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েও নিজেকে কর্মী বলতে পারেন - এই আত্মবিশ্বাস বংশপরম্পরা থেকে আসে না বরং অযোগ্য কেউ জন্মসূত্রে কোনো দায়িত্ব পেয়ে গেলে তার মধ্যে সবসময় একটা হীনমন্যতা কাজ করে। সে তখন যোগ্যদের বিতারণ করে অযোগ্যদের নিয়ে একটি স্তাবকমন্ডলী তৈরি করে রাখে। যার পরিণামে সবকিছু নিয়ে সে নিজেই ধ্বংস হয়। এই দোষ থেকে বিজেপি মুক্ত। যে দল যুবাদের সামনে আনে, সেই দলই ভবিষ্যৎ শাসন করে।

ভারত আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে দরকার রাজনীতির চরিত্র বদল। পরিবারতন্ত্র আর বৃদ্ধতন্ত্র এই দুই বিষই স্বাধীনতার পর ভারতীয় রাজনীতিকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করেছে। সেই বিষমুক্তির পথ একমাত্র দেখাতে পেরেছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

শ্রী নীতিন নবীনের প্রচেষ্টা ও দক্ষতায় ছত্তিশগড়ে জাতীয়তাবাদী ধ্বজা ওঠে। আর সেই সঙ্গে আরোও বড় স্তরে দায়িত্ব পাওয়ার দাবিদার হয়ে ওঠেন নীতিন।

যারই ফলাফল প্রথমে কার্যকরী এবং তারপরে সর্বভারতীয় সভাপতি পদে নির্বাচন। এই সময় তাকে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল আমাদের। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের নির্বাচনের আগে পূর্ব ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান সম্পন্ন কারো সর্বোচ্চ দায়িত্ব পাওয়া ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু বিজেপি কোনো পরিবারতান্ত্রিক দল নয় তাই এখানে সব সময়ই রিজার্ভ বেঞ্চ একজন কার্যকর্তা। নীতিন নবীনই এখন আমার বস। আর এখানেই উঠে আসে বিজেপি তথা হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী মানসিকতার বৈশিষ্ট্য। কংগ্রেস দলে বর্তমানে সভাপতি হিসেবে আছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু কোনোদিনও নেহেরু গান্ধী পরিবারের সদস্য হওয়ার দৌলতে তাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রাহুল গান্ধী খাড়গেকে এই সম্মান দিয়েছেন? সবার সামনে ঘোষণা করতে পেরেছেন যে তিনি একজন সাধারণ কর্মী আর খাড়গেই তার নেতা? উত্তর হল যে না পারেননি, আর কেন তিনি পারেননি আর কেন মোদী পারেন সেটাও হয়তো আমরা সবাই জানি। মোদী

নীতিন নবীনের মতো একজন তরুণের সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়া কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় -এটা একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক দর্শনের ফল। যেখানে নেতৃত্ব আসে যোগ্যতা থেকে, যেখানে 'বস' বদলায় কিন্তু ব্যবস্থা ভাঙে না, যেখানে প্রধানমন্ত্রীও নির্দ্বিধায় সভাপতির নেতৃত্ব মেনে নেন জনসমক্ষে।

এই সংস্কৃতি কোনো ঘটনা মাত্র নয়, এটা একটি গভীর আত্মপ্রত্যয়। আর ঠিক এই কারণেই শুধু আগামী এক-দুই দশক নয় - আগামী কয়েক প্রজন্মেও জাতীয় স্তরে বিজেপির বিকল্প তৈরি হওয়া সহজ হবে না।

বিকশিত ভারতের মজবুত বাজেট

দিব্যেন্দু দালাল

প্রাথমিক নজরে বাজেট ২০২৬–২৭ হয়তো 'বিগ ব্যাং' ঘোষণা-বিহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু গভীরে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়—এই বাজেট আসলে শব্দের নয়, দিকনির্দেশের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একে 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর পথে "মজবুত ভিত্তি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কথাটি শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য নয়; বাজেটের অঙ্ক ও অগ্রাধিকার সেটাই প্রমাণ করে।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন দেশ চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশের আর্থিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আর্থিক বৃদ্ধির হার তখন তলানিতে নেমেছিল সাথে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত হয়ে উঠেছিল ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির হার। এই অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আগের ইউপিএ সরকারের কাছে না ছিল কোন পরিকল্পনা, না ছিল সদিচ্ছা। হতাশাজনক এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শ্রী মুকেশ আম্বানী একে 'Policy paralysis' বলেছিলেন। সেই জায়গা থেকে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে প্রথম পাঁচ বছর এনডিএ সরকার বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্কারের মাধ্যমে লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়া ভারতীয় অর্থনীতিকে পুনরায় ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তার মধ্যেই কোভিড অতিমারী পুনরায় নতুন চ্যালেঞ্জ আনে, তথাপি ভারতীয় অর্থনীতি সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে দ্রুততম আর্থিক বৃদ্ধির সাফল্য অর্জন করে। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বজুড়ে তৈরী হওয়া মারাত্মক অস্থিরতার মধ্যেও ভারত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির থেকে আর্থিক বৃদ্ধির হারকে অবিচলিত রেখেছে।

২০২৫-২৬ -এর আর্থনৈতিক সমীক্ষা—

১) জিডিপি বৃদ্ধি — বিশ্বের সেরা তরঙ্গ

ভারতের বাস্তব GDP বৃদ্ধি ৭.৪%–এর কাছাকাছি অর্জিত হয়েছে যা দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক সক্ষমতা নির্দেশ করে।

২) আগামী অর্থবর্ষ ২০২৬-২৭-এ GDP বৃদ্ধি ৬.৮% - ৭.২% হবার পূর্বাভাস রয়েছে।

এটি বিশ্ব অর্থনৈতিক অস্থিরতার মাঝেও ভারতের স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে।

৩) মুদ্রাস্ফীতি — রেকর্ড কম স্তর

গড় শিরোনাম CPI মুদ্রাস্ফীতি মাত্র ১.৭% (২০২৫ এপ্রিল–ডিসেম্বর), যা দীর্ঘদিনের মধ্যে ন্যূনতম।

৪) উপভোগ এবং বিনিয়োগ — ব্যক্তিগত উপভোগ (PFCE) বৃদ্ধির হার ৭.৫%, এবং এটি মোট GDP-র ৬১.৫%–এ পৌঁছেছে। এটি গত দশকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

মূলধন বিনিয়োগ (GFCF) ৭.৬-৭.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভবিষ্যতের উৎপাদনশীলতা বাড়াবে।

৫) কৃষি ও খাদ্য — ধারাবাহিক উৎকর্ষতা:

খাদ্যশস্য উৎপাদন ৩৫৭.৭ মিলিয়ন টন, এবং বাগানজাত (horticulture) উৎপাদন ৩৬২.০৮ মিলিয়ন টন। এটি কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত বৈচিত্র্য ও আত্মনির্ভরতার লক্ষণ।

৬) ব্যাঙ্ক ও আর্থিক ক্ষেত্র — শক্তিশালী ভিত্তি

ব্যাঙ্কিং খাতে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ও Non-Performing Assets (NPAs) নিম্নে রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পতন: ২০১৮ সালে মোট এনপিএ প্রায় ১১.২%–১১.৫% এর সর্বোচ্চ স্তর থেকে সেপ্টেম্বর/মার্চ ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ২.১%–২.৩% এ নেমে এসেছে।

সরকারি খাতের ব্যাংকগুলির (PSBs) কর্মক্ষমতা: যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির আগে সর্বোচ্চ এনপিএ ছিল, তারা নাটকীয় উন্নতি দেখিয়েছে, তাদের জিএনপিএ অনুপাত **২০২১ সালে ৯%** এরও বেশি থেকে কমে **২০২৫ সালের মার্চ নাগাদ ২.৫৮%** হয়েছে।

নেট এনপিএ উন্নতি: নেট এনপিএ অনুপাতও তীব্র হ্রাস পেয়েছে, ২০২৫ সালের মধ্যে তা প্রায় ০.৫%–০.৫২%-এ নেমে এসেছে।

৭) বহির্বাণিজ্য — রেকর্ড রপ্তানি

দ্রব্য ও পরিষেবা রপ্তানি $৮২৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে (FY25), যা একটি রেকর্ড স্তর। এই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বিস্তৃত বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক শক্তিকে নির্দেশ করে।

মোদী সরকারের কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ উচ্চাভিলাষী হলেও আর্থিক শৃঙ্খলার প্রতি সতর্ক একটি রোডম্যাপ উপস্থাপন করেছে। এই বাজেটে ব্যয়, কর, ঋণগ্রহণ ও রাজকোষ ঘাটতি হ্রাস—সব ক্ষেত্রেই সরকার বড় অঙ্কের হিসাব সামনে রেখেছে। টেকসই উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি জনগণকেন্দ্রিক উন্নয়ন ও কাঠামোগত সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রণীত এই বাজেটে ভারত সরকার ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষে মোট ব্যয় ৫৩,৪৭,৩১৫ কোটি টাকার প্রস্তাব করেছে।

'যুব শক্তি-চালিত বাজেট' হিসেবে উপস্থাপিত এই আর্থিক নকশায় দরিদ্র, বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার 'সংকল্প' প্রতিফলিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই বাজেট 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'—এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

আকাঙ্ক্ষাকে সাফল্যে রূপান্তর এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অন্তর্ভুক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার থিমে প্রণীত এই বাজেটে ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি ধরা হয়েছে ৩,৯৩,০০,৩৯৩ কোটি, যা ২০২৫–২৬ সালের অগ্রিম হিসাবের ৩,৫৭,১৩,৮৮৬ কোটির তুলনায় প্রায় ১০% বৃদ্ধি। এই আশাবাদী পূর্বাভাস সরকারের প্রায় ৭% শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জনের আত্মবিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে, যা আর্থিক শৃঙ্খলা, মুদ্রানীতিগত স্থিতিশীলতা এবং সর্বাঙ্গীন সংস্কারের মাধ্যমে সমর্থিত। এটি প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল স্তম্ভগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা, মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলা, জনগণকেন্দ্রিক উদ্যোগ, আস্থাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, ব্যবসা ও জীবনযাপনের সহজতা বৃদ্ধি এবং সুদৃঢ় আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

রাজকোষীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে এই বাজেটে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজকোষ ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপির ৪.৩%, যা ২০২৫–২৬ সংশোধিত অনুমান (RE)-এর ৪.৪% থেকে কম। কোভিড মহামারির সময় ২০২০–২১ অর্থবর্ষে রাজকোষ ঘাটতি ৯.২%-এ পৌঁছানোর পর থেকে প্রতি বছরই এই ঘাটতি ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিমুখী প্রকল্পে অর্থায়ন অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ঋণগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কমানোর ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

১৬.৯৬ লক্ষ কোটি টাকার রাজকোষ ঘাটতি (জিডিপির ৪.৩%)-এর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব ঘাটতি ৫.৯২ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ১.৫%) এবং প্রাথমিক ঘাটতি ২.৯২ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৭%)। এই পরিসংখ্যানগুলি আগের বছরগুলির তুলনায় ঘাটতির ক্রমাগত সংকোচনের প্রবণতা নির্দেশ করে। একই সঙ্গে, ঋণগ্রহণ ও অন্যান্য দায়বদ্ধতা মিলিয়ে মোট পরিমাণও ১৬.৯৬ লক্ষ কোটি টাকা হিসেবে অনুমান করা হয়েছে।

প্রাথমিক নজরে বাজেট ২০২৬–২৭ হয়তো 'বিগ ব্যাং' ঘোষণা-বিহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু গভীরে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়—এই বাজেট আসলে শব্দের নয়, দিকনির্দেশের। এটি তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তার বাজেট নয়; এটি একটি রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির নথি। টানা নবমবার বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কার্যত একটি রেকর্ড গড়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একে 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর পথে "মজবুত ভিত্তি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কথাটি শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য নয়; বাজেটের অঙ্ক ও অগ্রাধিকার সেটাই প্রমাণ করে।

পরিকাঠামো: অর্থনীতির মেরুদণ্ড শক্ত করার প্রয়াস

১২.২২ লক্ষ কোটি টাকার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার—এটি কেবল একটি সংখ্যা নয়, এটি একটি দর্শন। রাস্তা, রেল, বন্দর, লজিস্টিক হাব ও নগর পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ মানে তাৎক্ষণিক কর্মসংস্থান তথা ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতা।

অর্থনৈতিক কাঠামোগত সংস্কার বজায় রাখতে বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই করতে উৎপাদন খাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিশেষত কৌশলগত ও ভবিষ্যতমুখী ক্ষেত্রগুলিতে। এর মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (ISM) ২.০, বায়োফার্মা শক্তি, সিপিএসই-তে উচ্চপ্রযুক্তি টুল রুম স্থাপন, রেয়ার আর্থ থেকে স্থায়ী চুম্বক উৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রকল্প, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কেমিক্যাল পার্ক, ইলেকট্রনিক্স উপাদান উৎপাদন, উচ্চ-মূল্য ও প্রযুক্তিনির্ভর নির্মাণ ও পরিকাঠামো যন্ত্রপাতির দেশীয় সক্ষমতা জোরদারকরণ, বস্ত্র খাতের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি, ২০০টি ঐতিহ্যবাহী শিল্প ক্লাস্টার পুনরুজ্জীবন এবং সাশ্রয়ী ক্রীড়া সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ।

প্রবৃদ্ধির ভিত্তি আরও মজবুত করতে পরিকাঠামো খাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঋণ নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য একটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ড গঠন, সিপিএসই-র স্থাবর সম্পত্তিকে বিশেষ রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (REIT)-এর মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার, **পূর্বে ডানকুনি থেকে পশ্চিমে সুরাট পর্যন্ত সংযোগকারী নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর স্থাপন,** খনিজসমৃদ্ধ অঞ্চলের জন্য ২০টি নতুন জাতীয় জলপথ কার্যকর করা, অভ্যন্তরীণ জলপথের জন্য জাহাজ মেরামত ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা, ২০৪৭ সালের মধ্যে উপকূলীয় জাহাজ পরিবহণের অংশীদারিত্ব ৬% থেকে ১২%-এ উন্নীত করার উদ্যোগ, দেশীয় উৎপাদন উৎসাহিত করতে সিপ্লেন ভিজিএফ স্কিম চালু, SASCI স্কিমের আওতায় রাজ্যগুলিকে ২ লক্ষ কোটি টাকার সহায়তা প্রদান এবং পূর্ব উপকূলের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্বোদয় (Purvoday) কর্মসূচি। এখানে উল্লেখ্য যে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করবে যদি রাজ্য সরকার এটিকে সদর্থক ভাবে কাজে লাগায়।

বাজেটে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে সাতটি উচ্চগতির রেলভিত্তিক 'গ্রোথ কানেক্টর' স্থাপনের প্রস্তাবও করা হয়েছে। এই রেলপথগুলি মুম্বই–পুনে, পুনে–হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ–বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ–চেন্নাই, চেন্নাই–বেঙ্গালুরু, দিল্লি–বারাণসী এবং বারাণসী– শিলিগুড়িকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

পুঁজিবাজারে নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগে উৎসাহ

ফিউচার ও অপশনে STT বৃদ্ধি একটি অ- জনপ্রিয় কিন্তু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত। জল্পনা কমিয়ে বাস্তব অর্থনীতিতে পুঁজি প্রবাহ বাড়ানোই লক্ষ্য।

অন্যদিকে, NRI ও PROI বিনিয়োগে ছাড় দিয়ে সরকার বিশ্বব্যাপী ভারতীয় পুঁজিকে দেশে ফেরানোর পথ প্রশস্ত করেছে। কর ব্যবস্থায় সরলতা ও স্বেচ্ছা প্রকাশের সুযোগ দেখায়—রাষ্ট্র শাস্তির আগে অনুগমন চায়।

উৎপাদন ক্ষেত্র: উৎপাদন খাতকে উৎসাহিত করতে বাজেটে একাধিক কর সংস্কারের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে

বন্ডেড জোনে মূলধনী পণ্য সরবরাহকারী অনাবাসীদের জন্য পাঁচ বছরের আয়কর ছাড়, উপাদান সংরক্ষণের জন্য সেফ হারবার বিধান, বিশ্বাসযোগ্য উৎপাদকদের ক্ষেত্রে শুল্ক পরিশোধে বিলম্বের সুবিধা, সামুদ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের কাঁচামালের জন্য শুল্কমুক্ত আমদানির সীমা বৃদ্ধি, জুতো আপার রপ্তানির জন্য ছাড়ের মেয়াদ বৃদ্ধি, পোশাক ও জুতো রপ্তানির ক্ষেত্রে সময়সীমা বাড়ানো এবং মাইক্রোওয়েভ ওভেন, বিমান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রাংশে মৌলিক কাস্টমস শুল্ক থেকে অব্যাহতি।

শিক্ষাক্ষেত্র: শিক্ষা খাতে ঐতিহাসিকভাবে ১.৩৯ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। ৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যের প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করে। বাজেটে বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ৮৩,৫৬২.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৬.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি। অন্যদিকে, উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৫৫,৭২৭.২২ কোটি টাকা, যা ১১.২৮ শতাংশের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বরাদ্দ অর্থবর্ষ ২০২১–এ ৮৪,২১৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে বর্তমান বছরে ১.৩৯ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা শিক্ষা ক্ষেত্রে নীতিগত ধারাবাহিকতা ও দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারের প্রমাণ। এটি জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২০২০–এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রতি দায়বদ্ধতাকে দর্শায়।

১৫,০০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৫০০টি কলেজে AVGC (অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস, গেমিং ও কমিকস) কনটেন্ট ল্যাব স্থাপনের ঘোষণা ডিজিটাল ও সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য যুবসমাজকে প্রস্তুত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রধান শিল্প ও লজিস্টিক করিডরের নিকটে পাঁচটি সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ স্থাপনের প্রস্তাব শিক্ষা, গবেষণা, দক্ষতা ও শিল্পের মধ্যে সংযোগকে আরও মজবুত করবে। একইভাবে, প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে মেয়েদের হোস্টেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত—যার জন্য প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবিত—উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ, নিরাপত্তা ও ধারাবাহিকতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

পর্যটন ও সংস্কৃতি: সফট পাওয়ারকে অর্থনীতির অংশ করা

পর্যটনকে আর 'সাইড সেক্টর' হিসেবে দেখা হচ্ছে না। পাহাড়ি ট্রেইল, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণে TCS হ্রাস—সব মিলিয়ে সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারতের সংস্কৃতি ও প্রকৃতি দুটোই অর্থনৈতিক সম্পদ।

টেক্সটাইল ও গ্রাম অর্থনীতি: কর্মসংস্থানের বাস্তব ইঞ্জিন

মেগা টেক্সটাইল পার্ক, খাদি ও হ্যান্ডলুমে গ্লোবাল ব্র্যান্ডিং—এই উদ্যোগগুলো শহুরে হেডলাইনের জন্য নয়, গ্রামীণ বাস্তবতার জন্য। 'গ্রাম স্বরাজ' এখানে স্লোগান নয়, একটি কর্মসংস্থান কৌশল।

ফার্মা ও মেডিক্যাল ট্যুরিজম: "বিশ্বের ফার্মেসি" থেকে "বিশ্বের হাসপাতাল"

১০,০০০ কোটির বায়োলজিকস বিনিয়োগ, মেডিক্যাল হাব ও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নেটওয়ার্ক দেখায়—ভারত তার ফার্মা ক্ষমতাকে আরও এক ধাপ উপরে নিয়ে যেতে চায়।

প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা: বাজেটের সবচেয়ে স্পষ্ট বার্তা

৭.৮৫ লক্ষ কোটি প্রতিরক্ষা বরাদ্দ, GDP-এর প্রায় ২%। ৭৫% ক্যাপিটাল ক্রয় দেশীয় শিল্পের জন্য সংরক্ষণ, DRDO-তে বড় বরাদ্দ, সীমান্ত পরিকাঠামো ও গোয়েন্দা সংস্থার বাজেট বৃদ্ধির একটাই অর্থ—ভারত দীর্ঘমেয়াদি, বহু-ফ্রন্ট চাপে থাকার বাস্তবতা মেনে নিয়েছে।

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ৬৯% বাজেট বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় জোর প্রমাণ করে, রাষ্ট্র এখন আর শুধু প্রতিক্রিয়াশীল নয়—সে প্রস্তুত।

পশ্চিমবঙ্গ সরাসরি উপকৃত হবে— কেন্দ্রীয় ঘোষণাসমূহ

- ৭টি NIPER (The National Institute of Pharmaceutical Education and Research) আপগ্রেডের ঘোষণা, যার মধ্যে পানিহাটিতে অবস্থিত NIPER কলকাতা অন্তর্ভুক্ত— এতে ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় রাজ্যের গুরুত্ব আরও বাড়বে।
- পাট শিল্পের জন্য নতুন প্রকল্প ঘোষণা — ন্যাশনাল ফাইবার স্কিম (National Fibre Scheme):

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ফাইবার বা তন্তু খাতে সর্বাঙ্গীণ আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলা। এর আওতায় প্রাকৃতিক তন্তু যেমন—রেশম, উল ও পাটের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট তন্তু (MMF) এবং নতুন প্রজন্মের আধুনিক তন্তু উন্নয়ন ও ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা হবে। দেশের বৃহত্তম পাট উৎপাদক রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরাসরি লাভবান হবে।

- ২০০টি ঐতিহ্যবাহী শিল্প ক্লাস্টার পুনরুজ্জীবন — এর মধ্যে সর্বাধিক সুবিধা পাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরনো শিল্পাঞ্চলগুলি।
- ডানকুনি–সুরাট নতুন ফ্রেইট করিডর — পূর্ব–পশ্চিম ফ্রেইট করিডরের মাধ্যমে বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যে গতি আসবে।
- বারাণসী–শিলিগুড়ি বুলেট ট্রেন প্রকল্পের ঘোষণা — পাশাপাশি বারাণসী–নয়াদিল্লি করিডরও অনুমোদিত হওয়ায় শিলিগুড়ি সরাসরি দিল্লির সঙ্গে যুক্ত হবে।
- ৫টি রাজ্যে মেডিক্যাল ট্যুরিজম হাব গড়ে তোলা হবে — উন্নত পরিকাঠামো ও নামী বেসরকারি হাসপাতালের কারণে কলকাতা হবে অন্যতম প্রধান লাভবান শহর।
- দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে মেয়েদের হোস্টেল, বিশেষত STEM বিষয়গুলিতে জোর — STEM গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার গুরুত্ব আরও বাড়বে।
- দুর্গাপুরে ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর উন্নয়ন — শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামোয় নতুন দিগন্ত।
- পূর্ব ভারতের জন্য ৫টি পর্যটন গন্তব্যের উন্নয়ন ও ৪,০০০ ই-বাস — পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ও পর্যটন বিকাশে পশ্চিমবঙ্গ বড় সুবিধা পাবে।

'বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না'

চাইলেও কি গুজরাট হতে পারবেন?

সোমনাথ গোস্বামী

২০১১ সাল। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের রাজনৈতিক বিস্ফোরণ হল। কিন্তু শিল্প ও উৎপাদনের বদলে রাজ্যে এল 'পাইয়ে দেওয়ার' অর্থনীতি। বাড়তে থাকে সরাসরি নগদ ভাতা ও সামাজিক সহায়তা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী—এই প্রকল্পগুলি তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিলেও রাজ্যের উৎপাদনভিত্তি মজবুত করতে পারেনি। ভাতা বা সামাজিক সহায়তা- কোনও একটি সরকার দিতেই পারে। কিন্তু সরকারে টিকে থাকতে ভাতা-নির্ভর হলে সেই সরকার হতশ্রী হতে পারে, গুজরাট হবেনা।

২৬ জানুয়ারি ২০০১। প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে গুজরাট কেঁপে উঠেছিল এক ভয়ংকর ভূমিকম্পে—রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল প্রায় ৭.৭। ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির নিরিখে এই বিপর্যয় স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রায় কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু, লক্ষাধিক মানুষ আহত এবং চার লক্ষেরও বেশি বাড়িঘর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়। কচ্ছ জেলার ভুজ, আনজার ও ভাচাউ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশ কার্যত বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। শুধু মানুষের জীবন নয়, ভেঙে পড়ে রাজ্যের উৎপাদন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ, সড়ক যোগাযোগ এবং প্রশাসনিক কাঠামো। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বললে, গুজরাটের কার্যক্ষমতা এক ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই গুজরাটের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যাত্রার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ২০০১ সালের শেষভাগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সামনে তখন কোনও উন্নয়ন নকশা প্রস্তুত ছিল না—ছিল একটি ভেঙে পড়া রাজ্য এবং সেই ভাঙন থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ। ভূমিকম্পের পর রাজ্য সরকার প্রথম যে মৌলিক পরিবর্তনটি করে, তা হল খরচের অগ্রাধিকার বদলানো। দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যয়ের বদলে গুরুত্ব দেওয়া হয় স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে—যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্প স্থাপনের উপযোগী জমি এবং পণ্য পরিবহণের নির্ভরযোগ্য স্থায়ী ব্যবস্থা তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়।

রাজ্যজুড়ে নতুন পাকা সড়ক তৈরি হয়, পুরনো পথ চওড়া করা হয় এবং শিল্পাঞ্চলগুলিকে বন্দর ও শহরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি সঞ্চালন ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়, যাতে বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য কারখানার কাজ থেমে না যায়। সুস্পষ্ট শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয় যেখানে দেশের মধ্যে প্রথম ইন্ডাস্ট্রি বেসড ক্লাস্টার অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাকে চিহ্নিত করে সেখানে সেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয় এবং শিল্প কে আধিকারিকস্তরে লাল ফিতের ফাঁস মুক্ত করা হয়।

এর প্রভাব খুব দ্রুত সংখ্যায় ধরা পড়তে শুরু করে। ২০০১–০২ সালে গুজরাটের nominal GSDP ছিল আনুমানিক দুই লক্ষ কোটি টাকার আশেপাশে। পরবর্তী প্রায় আড়াই দশকে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তা বেড়ে আজ প্রায় ত্রিশ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে। একই সময়ে রাজ্যের জাতীয় উৎপাদনের অংশ ধীরে ধীরে বেড়ে

সাড়ে আট শতাংশের আশেপাশে স্থিত হয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল এই বৃদ্ধির ধরন—গুজরাটে শিল্প উৎপাদনের অংশ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে আজ তিরিশ শতাংশের অনেক উপরে, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় স্পষ্টভাবেই বেশি।

বন্দরনির্ভর শিল্পায়ন গুজরাটের এই উত্থানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কান্ডলা (বর্তমানে দীনদয়াল), মুন্দ্রা, পিপাভবের মতো সরকারি ও বেসরকারি বন্দর মিলিয়ে রাজ্যে আজ চল্লিশের বেশি ছোট বড় কার্যকর বন্দর রয়েছে। দেশের মোট পণ্য পরিবহণের প্রায় চল্লিশ শতাংশ একাই গুজরাট সামলায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিমান যোগাযোগ—ন'টির বেশি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক বিমানবন্দর রাজ্যের শিল্প ও পরিষেবা অর্থনীতিকে দেশের ভিতর ও বাইরের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

শিক্ষা ও মানবসম্পদ ক্ষেত্রেও একই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে শুধু সংখ্যায় নয়, শিল্পের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তারই ফল আজ গুজরাটে EPFO-র আওতায় নথিভুক্ত আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান দেড় কোটির কাছাকাছি। একাধিক বছরের গড় ধরলে রাজ্যের বেকারত্বের হার তিন শতাংশের আশেপাশে—দেশের মধ্যে সর্বনিম্নগুলির একটি। মাথাপিছু আয় যেখানে আড়াই দশক আগে পঁচিশ হাজার টাকার কাছাকাছি ছিল, আজ তা তিন লক্ষ টাকার গণ্ডি অতিক্রম করেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নরেন্দ্র মোদী যে উন্নয়নের ভিত গুজরাটে স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারী মুখ্যমন্ত্রীরা তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীর পর আনন্দীবেন প্যাটেল, বিজয় রূপানি এবং বর্তমানে ভূপেন্দ্র প্যাটেল—মুখ্যমন্ত্রী বদলেছে, কিন্তু উন্নয়নের দিশা বদলায়নি। গত আড়াই দশকে বিজেপি শাসনে গুজরাটে উন্নয়ন ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

এই একই সময়ে দেশের পূর্ব প্রান্তে পশ্চিমবঙ্গও এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ছিল। দীর্ঘ বাম শাসনের পর জ্যোতি বসু রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে। শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক ও শিল্পবান্ধব এই মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে অনেকেই রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের প্রত্যাশা করেছিলেন। তাঁর আমলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ গড়ে ওঠে, কিছু IT সংস্থা রাজ্যে আসে এবং রাজ্য সীমিত হলেও নতুন ধরনের কর্মসংস্থানের স্বাদ পায়। বন্ধ শিল্প পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়, বড় শিল্পের জন্য জমি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

২০০১–০২ থেকে ২০১০–১১ এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের Nominal GSDP দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই উদ্যোগগুলি সমাজ ও রাজনীতির স্তরে স্থায়ী সমর্থন পায়নি। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম—এই দুই ঘটনায় শিল্পায়নের প্রশ্ন রাজ্যে উন্নয়নের ভাষা থেকে সংঘাতের ভাষায় বদলে যায়। বিনিয়োগকারীদের কাছে বার্তাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এই রাজ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, আর বাস্তবায়ন আরও কঠিন।

এই প্রেক্ষাপটেই ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আসে আর এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল জনসমর্থনে ক্ষমতায় আসে। এটি ছিল দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের রাজনৈতিক বিস্ফোরণ। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন সরকারের অগ্রাধিকার ছিল ভিন্ন। শিল্প ও উৎপাদনের বদলে রাজ্যের কেন্দ্রে আসে সরাসরি নগদ ভাতা ও সামাজিক সহায়তা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী—এই প্রকল্পগুলি তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিলেও রাজ্যের উৎপাদনভিত্তি মজবুত করতে পারেনি।

পরবর্তী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ধারা অব্যাহত থাকে। পশ্চিমবঙ্গের Nominal GSDP বেড়ে আজ আঠারো–উনিশ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু রাজ্যের জাতীয় উৎপাদনের অংশ নেমে এসেছে ছয় শতাংশের নিচে। মাথাপিছু আয় দেড় লক্ষ টাকার আশেপাশে—জাতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে। শিল্প উৎপাদনের অংশ ষোলো–আঠারো শতাংশের মধ্যেই আটকে। EPFO-র আওতায় নথিভুক্ত কর্মসংস্থান সীমিত, এবং একাধিক বছরের গড় ধরলে বেকারত্বের হার সাত শতাংশের কাছাকাছি।

পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও এই পিছিয়ে পড়া স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে কার্যত, মাত্র দু'টি পূর্ণাঙ্গ অপারেশনাল বাণিজ্যিক বিমানবন্দর—কলকাতা ও বাগডোগরা। বন্দর ব্যবস্থা একটি নদীবন্দর নির্ভর কাঠামোতেই আটকে। শিল্প কারখানার সংখ্যা দীর্ঘদিন ধরে স্থবির। সবচেয়ে বড় প্রমাণ আসে মানুষের চলাচল থেকে—আজ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম বৃহৎ শ্রম রপ্তানিকারক রাজ্য। কাজের খোঁজে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী রাজ্যের বাইরে পাড়ি দিচ্ছেন।

প্রায় আড়াই দশকের এই তুলনা একটি নির্মম সত্য সামনে আনে। গুজরাটে বিজেপি শাসনে উন্নয়ন হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন—নেতৃত্ব বদলালেও দিশা বদলায়নি। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে একাধিকবার, কিন্তু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা তৈরি হয়নি। কোথাও সংঘাত, কোথাও অনিশ্চয়তা, কোথাও ভাতানির্ভর অর্থনীতি— সব মিলিয়ে রাজ্যটি জাতীয় মঞ্চে ধীরে ধীরে প্রান্তে সরে গেছে।

একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত একটা রাজ্য এক দশকের মধ্যে দেশের প্রথম সারির রাজ্য হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর অন্য দিকে একদা শিল্প বাণিজ্য ও মেধার মিলনস্থল বলে পরিচিত বাংলা ক্রমশঃ নীতিহীনতায় দেশের অর্থনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে, তাই যখন বাংলার বাম ,তৃণমূল ও তাদের পোষিত বুদ্ধজীবীরা বলেন"বাংলা কে গুজরাট হতে দেব না" অজান্তে ভাগ্যবিধাতা হয়তো বলে উঠেন চাইলেও আপনারা কি আর বাংলা কে গুজরাট বানাতে পারবেন?

ভারত–ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি
ট্রাম্পের ডিলের ফাইল-মুক্তি

অনিকেত মহাপাত্র

কথার লড়াইয়ে না গিয়ে উপযুক্ত বিকল্প খোঁজার দিকে নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টি ছিল স্থির। আর এই ক্ষেত্রেও সুযোগ করে দিয়েছিলেন ' ট্রাম্প দ্য লিবারেটার'। ইউরোপীয় নেতাদের খিল্লি, রাশিয়া ঘেঁষা অবস্থান, ট্যারিফ চাপানো, ন্যাটোর ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব এবং গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বক্তব্য ইউরোপকেও বিকল্প নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল। 'মাদার অব অল ডিলস'-এর সূত্রপাত ঠিক এই দ্বিপক্ষীয় বিকল্প খোঁজার জায়গা থেকে।

'কানু বিনে গীত নাই'! আর ট্রাম্প বিনে ডিল নাই। সমার্থক! 'ডিল' কিংবা' রিসিপ্রোকাল', ট্যারিফ' এই শব্দগুলি নুতন কিছু নয় । কিন্তু ট্রাম্প-জামানায় এইগুলি বহুব্যবহৃত ও বাণিজ্যিক যুদ্ধের মারক অস্ত্র। যদিও এই লেখাটি সদ্য সম্পাদিত ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক কিন্তু এর আগেও ট্রাম্প আর পরেও ট্রাম্প। ট্যারিফ যেন ছিল এক বহু লক্ষ্য-ভেদী ও ইচ্ছা অনুযায়ী স্বয়ং গতি সঞ্চারী ক্ষেপণাস্ত্র । যা কোনও যুক্তি ও বিবেচনার অধীন নয়। সকালে উঠে যদি ট্রাম্পের মনে হয় ১০০ শতাংশ ট্যারিফ ধার্য করবেন কোনও দেশের ওপর, তাহলে 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ গিয়ে লিখে দিলেই হল; ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ সম্পন্ন। সেটি ৫০০ শতাংশও হতে পারে যদি সেইদিন সকালটা খুব মেঘলা হয় বা শ্রীমতি ট্রাম্প সেইদিন ভালো করে ব্রেকফাস্ট না করান।

ট্রাম্প গ্রেট ডিল মেকার নিঃসন্দেহে। তাঁর ডিলের ভয়ে অনেক বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনায়কের দিলও থরো থরো। মুশকিল হল তিনি রিয়েল এস্টেটের বিজনেস করেছেন আর রিয়েলিটি শো করেছেন কিন্তু গুজরাতি হিরে ব্যবসায়ীকে তো আগে ওইভাবে ডিল করেন নি । বেগুনের আড়ৎদার হিরের বিজনেস না বুঝুন, হিরে ব্যবসায়ী যেমন হিরের বিজনেস বোঝেন তেমনি রোজ প্রায় দেড়শো কোটি লোকের আলু-বেগুনের যোগান দেন । তাই এই শর্মা বড়োই শক্ত ঠাঁই । ট্রাম্পও ব্যবসায়ী তাই হিরের কাঠিন্য তিনি বুঝে ছিলেন কিন্তু ততক্ষণে তা তাঁর গলায় আটকে গেছে। গলায় ঢুকিয়ে দেবার কাজটি খুবই যত্নের সঙ্গে করে ফেলেছেন তাঁর ডিল মেকার সঙ্গীরা মিডিয়ায় বড়ো বড়ো ইন্টারভিউ দিয়ে। অবশ্য তিনি নিজেও এই বিষয়ে যথেষ্ট সক্ষম।

ভারত কোনও বাড়তি মন্তব্য করেনি। কোনও বাগাড়ম্বরে যাননি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা অন্যেরা। বাণিজ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল শক্ত স্নায়ুর পরিচয় দিয়েছেন। মার্কিনিরা ভারত সরকারের ওপর চাপ দিতে চেয়েছিল শ্রী গোয়েলকে এই বোঝাপড়া থেকে সরানোর ব্যাপারে। এইবার প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার নিজেদের স্বাভিমানের পরিচয় দিয়েছিলেন এই চাপকে পাত্তা না দিয়ে । আর এই সময়ে আর একটি কাজ করেছিল ভারত। কথার লড়াইয়ে না গিয়ে উপযুক্ত বিকল্প খোঁজার দিকে তার দৃষ্টি ছিল স্থির। আর এই ক্ষেত্রেও সুযোগ করে

দিয়েছিলেন ট্রাম্প দ্য লিবারেটার। ইউরোপীয় নেতাদের খিল্লি, রাশিয়া ঘেঁষা অবস্থান, ট্যারিফ চাপানো, ন্যাটোর ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব এবং গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বক্তব্য ইউরোপকেও বিকল্প নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল। 'মাদার অব অল ডিলস'-এর সূত্রপাত ঠিক এই দ্বিপক্ষীয় বিকল্প খোঁজার জায়গা থেকে। এই ডিল কিন্তু সামনের দিনগুলিতে পাওয়ার অর্ডারে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এইবার আমরা ডিল-দর্শন সেরে নিতে পারি।

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-অর্থনীতি দ্রুত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্বিন্যাস এবং বহুমুখী শক্তিকেন্দ্রের উত্থানের ফলে জন্যই লাভজনক হবে।

ভারত–ইইউ বাণিজ্য-সম্পর্ক নতুন নয়। বহু বছর ধরে ইউরোপ ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার। তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ শিল্প, টেক্সটাইল, চামড়া, অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ, কৃষিপণ্য—ভারতের বহু দিক ইউরোপীয় বাজারের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে ইউরোপের জন্য ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার, যেখানে শিল্প যন্ত্রপাতি, নবায়নযোগ্য শক্তি প্রযুক্তি, বিলাসপণ্য ও উচ্চমানের পরিষেবা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই বাণিজ্য নানা শুল্ক, অশুল্ক বাধা এবং নিয়ন্ত্রক জটিলতার কারণে পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারেনি।

বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। এতে ভারত কেবল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে নয়, বরং একটি বৈশ্বিক উৎপাদন হাব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

তবে এই চুক্তি শুধু অর্থনৈতিক নয়, কৌশলগত গুরুত্বও বহন করে। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশ ভূ-রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। ভারত ও ইউরোপ উভয়েই বহুপাক্ষিকতা, নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এবং মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে। এই চুক্তি সেই মূল্যবোধের প্রতিফলন। এটি এমন এক সময় ঘটছে, যখন বহু পশ্চিমি দেশ অন্য শক্তির সঙ্গে সম্পর্ককে রাজনৈতিক শর্তে বেঁধে রাখতে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আর কেবল পণ্য বিনিময়ের বিষয় নয়—এটি কৌশল, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রশ্ন। এই প্রেক্ষাপটে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি কেবল একটি অর্থনৈতিক সমঝোতা নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভিত্তি।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক ব্লক, যেখানে প্রায় ৪৫ কোটি মানুষের বাজার এবং উচ্চ ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে। অন্যদিকে ভারত দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি, যার জনসংখ্যা, উৎপাদন সক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা আগামী দশকে বিশ্ব অর্থনীতির ভারসাম্য বদলে দিতে সক্ষম। এই দুই শক্তির মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে তা উভয়ের

এই চুক্তির মূল গুরুত্ব এখানেই। শুল্ক হ্রাস, বিনিয়োগ সহজীকরণ, পরিষেবা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে ভারত ও ইইউ উভয়েই নিজেদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে পারবে। বিশেষত "মেক ইন ইন্ডিয়া" ও "আত্মনির্ভর ভারত" কর্মসূচির সঙ্গে এই চুক্তি গভীরভাবে সংযুক্ত। ইউরোপীয় বিনিয়োগ ভারতের উৎপাদন খাতে এলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, দক্ষতা উন্নয়ন হবে এবং দেশীয় শিল্প আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে পারবে।

এই চুক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্গঠন। কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে অনেক দেশ একক উৎসের উপর নির্ভরতা কমাতে চাইছে। ইউরোপের জন্য ভারত একটি নির্ভরযোগ্য

চাইছে। ভারত–ইউরোপীয় ইউনিয়ন চুক্তি সেই প্রবণতার বাইরে গিয়ে পারস্পরিক সম্মান ও স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে।

কৃষি, শ্রম মান, পরিবেশ এবং তথ্য সুরক্ষা—এই সব বিষয়ে অবশ্যই মতপার্থক্য রয়েছে। ইউরোপ কঠোর পরিবেশ ও শ্রম মান নিয়ে বক্তব্য আরোপ করতে চায়, অন্যদিকে ভারত তার উন্নয়ন বাস্তবতার কথা তুলে ধরে। কিন্তু এই মতভেদ আলোচনার মাধ্যমেই মীমাংসা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, এই আলোচনাই ভারতের জন্য একটি সুযোগ—নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে তুলে ধরার এবং উন্নয়ন ও ন্যায্যতার মধ্যে ভারসাম্য আনার।

সবচেয়ে বড় কথা, এই বাণিজ্য চুক্তি ভারতের কূটনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে আরও শক্তিশালী করবে। ভারত দেখাতে পারবে যে

সে একদিকে রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে, অন্যদিকে ইউরোপের সঙ্গেও সমান মর্যাদার অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম। এটি ভারতের বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতির বাস্তব উদাহরণ।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ভারত–ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য চুক্তি কেবল শুল্ক বা রপ্তানি বৃদ্ধির হিসাব নয়। এটি ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, কৌশলগত স্বাধীনতা এবং বৈশ্বিক অবস্থানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এই বছর ২৭ জানুয়ারি দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দে লিয়েন এবং ইইউ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তা সহ প্রতিনিধিমণ্ডলীর উপস্থিতিতে হওয়া এই ডিল হোয়াইট হাউসে থাকা পিস মেকার কাম ডিল মেকারের স্নায়ুচাপ বৃদ্ধি করল বইকী ! তাই ফেব্রুয়ারি মাসের একেবারে শুরুতে ট্রাম্প ঘোষণা করলেন ভারত- আমেরিকার ট্রেড ডিলের কথা। আর আমেরিকার বাণিজ্যিক মহল এই ডিলকে আদর করে নাম দিলেন 'ফাদার অব অল ডিলস'।

একটা কথা বহু দিন ধরে বলে আসছি, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যে যাই বলুন তিনি গড়পড়তা মানুষের থেকে বেশি সুস্থ। তিনি খুব পরিস্কার করে জানেন তিনি কি করতে চান। একটাও কাজ তিনি বাড়তি করছেন না। ডালপালাগুলো ছাঁটছেন তিনি বিষবৃক্ষের। ভেনিজুয়েলা অভিযান তার একটা অঙ্গ। চিনের একটা লাইফ লাইন বন্ধ হল। পূর্বেই পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে চিন থেকে একটু সরিয়েছেন। আমেরিকান ডিপ স্টেটকে নাড়া দিচ্ছেন। কারণ এখন আমেরিকার পরিকল্পনা 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এর ওয়ালে হয়। 'ন্যাটো'র বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। 'ফাইভ আই'-এর চোখে ভালোই খোঁচা দিয়েছেন। ট্রাম্প প্রায় যা যা করছেন তাতে ঘুরিয়ে ভারতের লাভ বই লোকসান নেই। পাকিস্তান নিয়ে তাঁর খেলাটা যারপরনাই নিষ্ঠুর। বালুচদের হাতে আমেরিকান অস্ত্র।নাইট ভিশন ক্যামেরা ও চশমা। তালিবানদের থেকে আসতে পারে ন্যাটোর ফেলে যাওয়া অস্ত্র। কিন্তু এত সংখ্যক ! তালিবানকে তো নিজেকেও রক্ষা করতে হবে, আটকাতে হবে পাকিস্তানকে। তাই অঢেল দেবার সামর্থ্য নেই। হোয়াইট হাউসে বিনি পয়সায় খাওয়া লাঞ্চ প্লেটের দাম দিতে হবে ফিল্ড মার্শাল মুনিরকে। বালোচিস্তান, চিনেও খেলা শুরু হয়েছে। শেষ করব ডিল দিয়েই। একেবারে পাকিস্তানি নিদর্শন সহ।

উমর আলি নামে একজন পাকিস্তানি এক্স ইউজার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন-

ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিল্ড মার্শালের সঙ্গে এমন এক উপপত্নীর মতো আচরণ করেছেন যে তার প্রেমিককে সব অবৈধ এবং নোংরা কাজে সমর্থন করে এবং যখন কিছু দেওয়া বা নেওয়ার সময় আসে, তখন সেই নারী বলে আমি আমার পরিবারের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য, আমাকে ভুলে যাও। আমার শরীর আমার স্বামীরই থাকবে, কিন্তু আমার আত্মা সর্বদা তোমারই থাকবে।

খালিদ মাহমুদ নামের এক এক্স ইউজার তাঁর হ্যান্ডেলে লিখেছেন-

"গত ৬ মাসে ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ওমান এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং এখন ট্রাম্পের শুল্ক ১৮%-তে কমিয়ে আনা হয়েছে- সবই কারও সঙ্গে যোগসাজশ না করে বা নোবেল পুরস্কারের জন্য কাউকে মনোনীত না করে।"

একেবারে কাজের কথাটি বলেছেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রাক্তন মন্ত্রী হাম্মাদ আজহার- আধুনিক যুগে পররাষ্ট্র নীতি অপটিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না। এটি অর্থনৈতিক শক্তি, শুল্ক এবং বাজারে প্রবেশাধিকারকে কাজে লাগানোর বিষয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলি এই বিষয়টি প্রমাণ করে দিয়েছে। চাটুকারিতা এবং ছবি তোলা অকেজো।"

দুর্জনেরা বলে ফিল্ড মার্শাল মুনির স্যুটকেসে করে রেয়ার আর্থ নিয়ে গিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে ট্রাম্প সাহেবকে খুশি করতে। লাহোরিরা বলেছিল, মুনির? বহত বড়া আদমি আছে! শেষে কিনা এই ছিল তোর মনে! ভারত ১৮ শতাংশ কিন্তু পাকিস্তান ১৯ শতাংশ। কি? বহুবিশ্রুত ও ট্রাম্প-কথিত ট্যারিফ। দেখুন গিয়ে বালোচিস্তানের কালাতের সেই নবাবের (খান) মঞ্জিলের ভেঙে পড়া পাঁচিলের ওপর বসে ট্রাম্প পা দোলাচ্ছেন। হাতে কিন্তু ডিলের কপি। যে নবাব ভুল লোকের (জিন্না) সঙ্গে ডিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে কারণে আজও বালোচিস্তান রক্ত ঝরাচ্ছে বহু প্রজন্ম জুড়ে। বালোচিস্তানের ডিলের কাগজেও ১৮ শতাংশই লেখা।

দুর্গাপুরে ভিড়িঙ্গি কালী মন্দিরে মা কালীর চরণে পূজা অর্চনা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন মহাশয়ের।

নয়াদিল্লিতে এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে বর্ষীয়ান নেতৃত্বের সঙ্গে শ্রী নীতিন নবীন মহাশয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসে নয়াদিল্লির কর্তব্য পথে সেনাবাহিনীর চোখধাঁধানো প্যারেড ও বর্ণময় শোভাযাত্রা।

মাত্র ৩ ঘণ্টার বৈঠক প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ নাহয়ান-এর। বাতিল পাকিস্তান-আমিরশাহি বিমানবন্দর চুক্তি।

নয়াদিল্লির গান্ধী-স্মৃতিতে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধা।

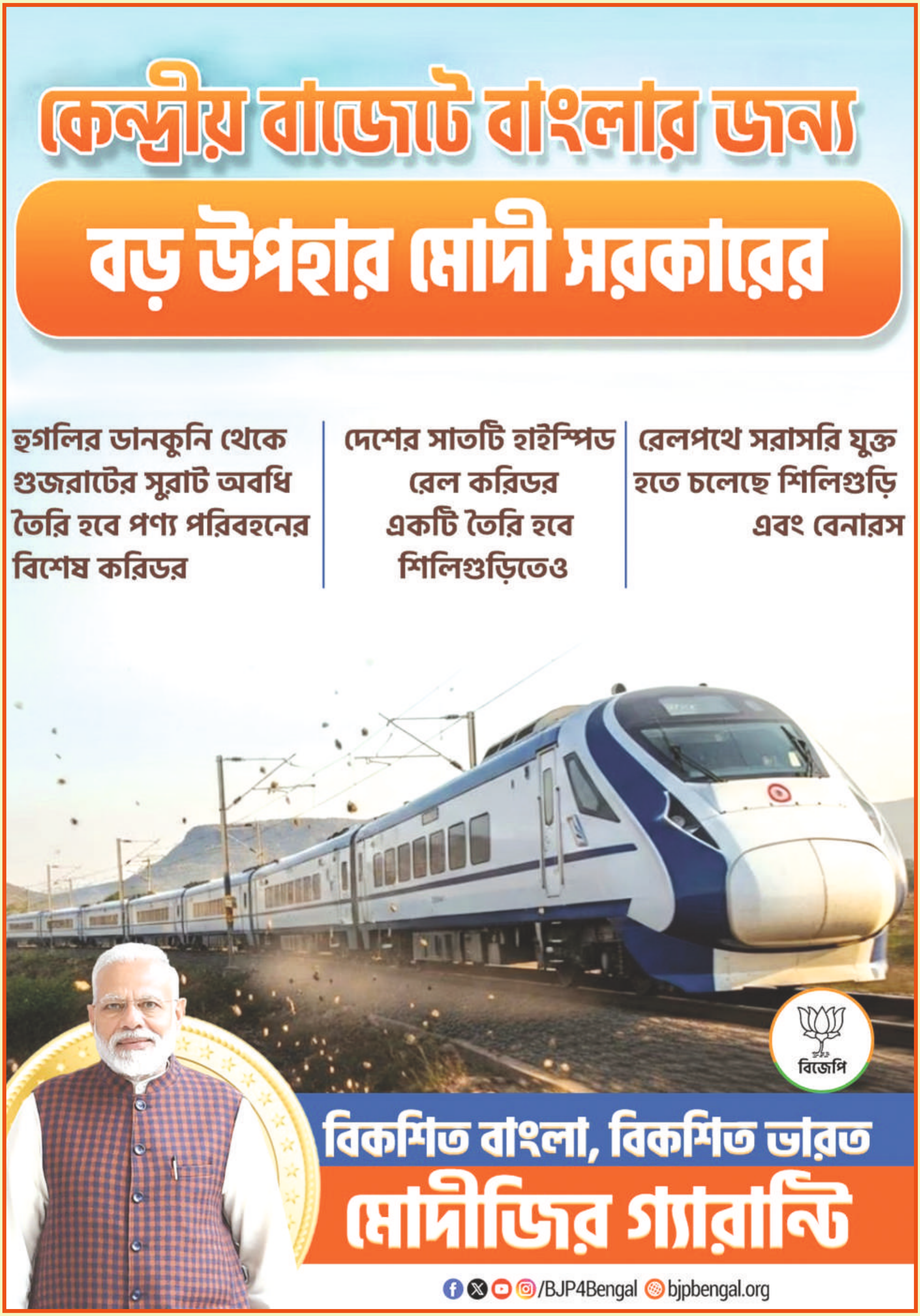

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।